১০০ ১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৫ বর্ষ | ১০ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ | ১৫ মহর্‌রম, ১৪৩৪ হিজরি | ৩০ নবুওয়ত, ১৩৯১ হি. শা. | ৩০ নভেম্বর, ২০১২ ঈসাব্দ

গত ২৫ নভেম্বর ২০১২ সকাল ৮টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌলভীপাড়ায় মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমান, ন্যশনাল আমীর বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী লোগো'র পর্দা উন্মোচন করেন

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Member | REHAB

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388
01819-296797
01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌশিক
প্রপার্টিজ লিঃ

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

Veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
CEO

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

mwPcÎ

ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না

খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র, খোলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.)-এর পুত্র, হযরত ইমাম হোসেন (রা.) অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কারবালা প্রান্তরে চক্রান্তকারী ইয়াজিদ বাহিনীর কাছে মাথানত না করে পবিত্র মহররম মাসের ১০ তারিখে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেছিলেন। হযরত ইমাম হোসেন (রা.) সেদিন ন্যায় ও সত্যের মনদন্ড সমুন্নত রাখতে চরম আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা সর্বকালে অনুকরণীয়। শিয়ারা হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর শাহাদতের শোকে যে মাতম করে তা আবেগ তাড়িত অমুলক কাজ, এজন্য আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর শাহাদতের দিনকে স্মরণ করে যথার্থই লিখেছেন, 'ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না'।

হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর ত্যাগের কথা স্মরণ করে পরিবহণ ব্যবস্থা অচল করে অপরকে কষ্ট দিয়ে শোক প্রকাশের শিক্ষা ইসলামে নেই আর শোক দিবস পালনের কোন অনুমতিও শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর উম্মতকে দেননি। তবে হযরত রসূল করীম (সা.) মৃত ব্যক্তির জন্য মাত্র তিন দিন শোক পালনের অনুমতি দিয়েছেন আর মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীর পক্ষে চার মাস ১০ দিন ইদ্দতকাল পালনের নির্দেশ রয়েছে। পক্ষান্তরে শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসেন (রা.) বলে গেছেন- *'আমি শহীদ হলে তোমরা আমার জন্য উহ্! আহ্! করো না, আঁচল ছিঁড়ো না, বরং ধৈর্য ধারণ করে থাকবে'*।

যদি ইসলামে শোক দিবস পালন করার কোন বিধান থাকতো তাহলে শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাত দিবসই শোক পালনের প্রধান দিবস হতো। কেননা তিনিই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, ইহজগত ও পরজগতের অকৃত্রিম বন্ধু এবং মোমেনদের জন্য হুযূর (সা.)-এর ওফাত অপেক্ষা শোকের আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আমরা হুযূর (সা.)-এর ওফাত দিবস শোক দিবস হিসেবে পালন করি না। কারণ তা ইসলামে বৈধ নয়। আর হুযূর (সা.)-এর পরবর্তী সময়ে খোলাফায়ে রাশেদিন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন ও মুজতাহিদ ইমামরা কেউ তা পালন করেননি। ইসলামে শোক দিবস পালন না করার বহু দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। বদরের যুদ্ধে ১৩ জন, ওহুদের যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শাহাদতবরণ করেন এবং হুযূর (সা.)-এর চাচা সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত আমীর হামজা (রা.) ওহুদের ময়দানে নির্মমভাবে শহীদ হন। তাঁর নাক, কান কেটে বিকৃত করা হয়। বুক চিরে কাঁচা কলিজা পর্যন্ত চিবানো হয়। মহানবী (সা.) খুবই মর্মান্তিক এ ঘটনার পর শোকাভিভূত হয়ে প্রায় আট বছর দুনিয়ায় ছিলেন তবুও দীর্ঘ এ আট বছরে হুযূর (সা.) হযরত হামজা (রা.)-এর জন্য কোন শোক দিবস পালন করেননি।

এছাড়াও খোলাফায়ে রাশেদিনের তিন খলিফা হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) শাহাদত বরণ করেছেন। তাঁদের শোকেও তো মাতম করার কোন উল্লেখ ইসলামে পাওয়া যায় না। কারণ ইসলামে এর কোন অস্তিত্ব নেই।

৩০ নভেম্বর ২০১২

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা (৯ নভেম্বর ২০১২)**	৫
ইসলাম কি বিশ্বশান্তির জন্যে ভীতির কারণ? পোলান্ডের ওয়ারশ' বিশ্ববিদ্যালয় সেমিনারে উপস্থাপিত বক্তব্য মৌলানা আতাউল মুজিব রাশেদ, ইমাম, মসজিদ ফযল, লন্ডন। ভাষান্তর : মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ	১২
ইমাম হুসাইন (রা.) এবং কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা মূল : হাফেজ মোজাফ্ফর আহমদ সাহেব, রাবওয়া অনুবাদ : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	১৭
শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মাহমুদ আহমদ সুমন	২১
হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর হাজারো নিদর্শন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.) মোজাফফর আহমদ রাজু	২৩
এক চরম বিদ্বেষীর সত্যের অকপট স্বীকারোক্তি	২৪
বাবা-মায়ের সন্তুষ্টিই কল্যাণের উৎস মুহাম্মদ আমীর হোসেন	২৫
প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২৬
কবিতা, শোক সংবাদ	২৭
পাঠক কলাম	২৮
সংবাদ	৩১
Celebration of Centenary of Initiation of Collective Baiat in Bangladesh Held Ahmad Tabshir Choudhury	৩২
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩৫
এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও	৩৬

অতএব, নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি হযরত ইমাম হোসেন (রা.) খিলাফতে রাশেদার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নিজ দেহের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত দান করে গেছেন, যুগ যুগ ধরে তাঁর এই ত্যাগ মুসলিম উম্মাহকে খিলাফতে রাশেদার অনুরূপ আল্লাহ্ মনোনিত খলীফা ও ঐশী ইমামত-এর ছত্র-ছায়ায় জীবন অতিবাহিত করার অনুপ্রেরণা জোগাবে।

ইমাম হোসেনের ত্যাগ, কুরবানী আমাদের জন্য জীবন্ত এক শিক্ষা রেখে গেছে। হযরত ইমাম হোসেন (রা.) যে আদর্শ রেখে গেছেন তা সব সময় আমাদের আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। সত্য, ন্যায় এবং নবুওয়তের পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র জমিনে সত্যিকারের ইসলামী খিলাফত পুণ:প্রতিষ্ঠিত জামাত-আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য হিসেবে আমরা সত্যের পথে এবং অসত্যের বিরুদ্ধে হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করায় সর্বদা উজ্জীবিত থাকবো, ইনশাআল্লাহ্।

কুরআন শরীফ

সূরা আর্ রা'দ-১৩

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٣﴾

৩৩। আর নিশ্চয় তোমার পূর্বেও রসূলদের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু যারা অস্বীকার করেছিল, আমি কিছু কালের জন্য তাদের অবকাশ দিয়েছিলাম। এরপর আমি তাদের ধরে ফেললাম। এখন দেখ! আমার শাস্তি কেমন (শিক্ষণীয়) ছিল!

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۚ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۚ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٤﴾

৩৪। অতএব, যিনি প্রত্যেকের কৃতকর্মের পর্যবেক্ষক, তিনি কি তাদের হিসাব নিবেন না? তারা আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করেছে। তুমি বল, 'তোমরা তাদের নামতো[১৪৪৫] বল!' তোমরা কি তবে পৃথিবীর এমন কোন বিষয় তাঁকে জানাবে, যা তিনি জানেন না? নাকি (এসব) কথার কথা? আসলে যারা অস্বীকার করেছে, তাদেরকে তাদের প্রতারণা সুন্দর[১৪৪৬] করে দেখানো হয়েছে। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন, তার জন্য কোন হেদায়াতদাতা নেই।

১৪৪৫। এই কথা দ্বারা মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের উপাস্য দেবদেবীর নাম বল দেখি, অর্থাৎ-তাদের কর্মকান্ড বা গুণাবলী কি? এই আয়াতে 'নাম' শব্দটি দ্বারা 'ব্যক্তিগত নাম' বুঝায় না, 'গুণবাচক নাম' প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, তাদের কিছু দেবদেবীর ব্যক্তিগত নাম কুরআনে উল্লেখ রয়েছে (৭১ : ২৪)। 'নাম তো বল' শব্দত্রয় ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য-ভাবের প্রকাশক, অর্থাৎ-অংশীবাদীদের (মূর্তি পূজারীদের) দেবদেবী এতই তুচ্ছ্য যে, সেগুলোর নাম উচ্চারণ করতেও তাদের লজ্জায় পড়তে হয়।

১৪৪৬। প্রায়শ এরূপ ঘটতে দেখা যায় যে, যখনই কোন লোক পার্থিব-স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে প্রতারণার আশ্রয় নেয়, তখন সে ক্রমশ: নিজেই নিজের প্রতারণার শিকার হয়ে যায়।

হাদীস শরীফ

মিথ্যাচারিতা খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায়

কুরআন ঃ

"তোমরা মূর্তিপূজার শির্‌ক থেকে বাঁচো এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকো।" (সূরা হজ্জ ঃ ৩১)

হাদীস ঃ

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে তিনটি বড় গুনাহ্ সম্বন্ধে অবগত করবো? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা মাতার অবাধ্যতা করা। তিনি (সা.) তখন হেলান দিয়ে বসেছিলেন, তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, খবরদার মিথ্যা কথা বলা থেকে বাঁচো । তিনি (সা.) এ কথাটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম, হায়! যদি তিনি (সা.) চুপ করে যেতেন" (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ

ইসলাম মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তাকে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে খোদার নিকট পৌঁছে দিতে চায়। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছে, মূর্তিপূজা, মিথ্যাচারিতা ও পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, এই তিনটি বড় গুনাহ্ মানুষকে খোদা থেকে দূরে নিয়ে খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং তার আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, অংশীবাদিতা, পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, বাস্তব কথা হলো এই যে, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে, ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না। দুনিয়ার হীন-ব্যক্তি বলতে পারে যে, মিথ্যা ব্যতিরেকে চলা যায় না। এটা এক অযথা কথা।

যদি সত্য দ্বারা চলা সম্ভব না হয়, তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানে না যে, খোদার আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাণদাতা ও মা'বুদ মনে করে।

এজন্য আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে প্রকৃত-পবিত্রতা দান করুন এবং সকলকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

খোদা তাআলার সাহায্যেই খোদা তাআলাকে লাভ করা যায়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদার নাম পরাক্রমশালী। তিনি স্বীয় সম্মান কাউকেও দেন না; কেবল তাদেরকেই দেন, যাঁরা তাঁর ভালবাসায় নিজেদেরকে (সত্তাকে) হারিয়ে ফেলে। খোদার এক নাম যাহের। যারা তাঁর তৌহীদ ও এক-অদ্বিতীয় গুণের প্রকাশস্থল এবং যারা তাঁর প্রেমে বিলীন হয়ে যায়, তারা তাঁর গুণাবলীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। এদেরকে ব্যতীত তিনি অন্য কারও নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন না। স্বীয় জ্যোতি: হতে তিনি তাদেরকে জ্যোতি: দান করেন, স্বীয় জ্ঞান হতে তিনি তাদেরকে জ্ঞান দান করেন। তখন তারা নিজেদের সমগ্র মন প্রাণ ও ভালবাসা দ্বারা সেই নি:সঙ্গ বন্ধুর উপসনা করে এবং তার সন্তুষ্টি এইভাবে চায়, যেভাবে তিনি নিজেই চাহেন।

মানুষ খোদার উপসনার দাবী করে। কিন্তু কোন্ উপাসনা? কেবলমাত্র অনেক সেজদা, রুকু ও কেয়াম দ্বারা কি এই উপাসনা হয়? অথবা যারা অনেকবার তসবীহের দানা টিপে, তাদেরকে কি খোদা-প্রেমিক বলা যেতে পারে? বরং উপাসনা তার দ্বারা হতে পারে, যাকে খোদার ভালবাসা এই পর্যায়ে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে যে, তার নিজের সত্তা মধ্য হতে উঠে যায়। প্রথমত: খোদার অস্তিত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে। অত:পর খোদার সৌন্দর্য ও দয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হতে হবে। এতদ্ব্যতীত তাঁর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক এইরূপ হবে, যেন প্রেমের-বেদনা সর্বদা হৃদয়ে বিরাজ করে এবং এই অবস্থা প্রতি মুহূর্তে চেহারায় বিকশিত হয়। খোদার মহিমা হৃদয়ে এইরূপে থাকতে হবে, যেন সমগ্র বিশ্ব তাঁর সত্তার সম্মুখে মৃত সাব্যস্ত হয়। প্রতিটি ভীতি তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। তাঁর বিরহ-বেদনায় কাতরতার স্বাদ লাভ করতে হবে। তাঁর সাথে একান্তে স্বস্তি লাভ করতে হবে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো নিকট হৃদয়ের শান্তি পাওয়া যাবে না।

যদি অবস্থা এরূপ হয়ে যায়, তবে এর নাম উপাসনা। কিন্তু খোদা তাআলার বিশেষ সাহায্য ছাড়া এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এই জন্য খোদা তাআলা এই দোয়া শিখিয়েছেন ***: ইয়াকানা বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন-*** অর্থাৎ আমরা তোমার উপসানা তো করি। কিন্তু তোমার পক্ষ হতে বিশেষ সাহায্য না পেলে আমরা কখনো উপাসনার হক্ আদায় করতে পারি না। খোদাকে নিজের প্রকৃত-প্রেমিক সাব্যস্ত করে তাঁর উপাসনা করাই ***'বেলায়েত'*** (বন্ধুত্ব)। এরপর আর কোন স্তর নেই। কিন্তু তাঁর সাহায্য ছাড়া এই স্তর লাভ করা যায় না। এটা লাভ করার চিহ্ন এই যে, খোদার মহিমা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, খোদার প্রেম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্তর তাঁর উপর ভরসা করবে, তাঁকে পছন্দ করবে, সকল কিছুর উর্ধ্বে তাঁকে প্রাধান্য দিবে এবং তাঁর স্মরণকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করবে। যদি ইব্রাহীমের ন্যায় নিজের হাতে নিজ প্রিয়-পুত্রকে যবাই করার আদেশ হয়, বা নিজেকে আগুনে ফেলার জন্য ইঙ্গিত হয়, তবে এইরূপ কঠোর-আদেশকেও ভালবাসার আবেগে পালন করবে এবং স্বীয় প্রিয় প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এতখানি সচেষ্ট হতে হবে, যাতে তাঁর আনুগত্যে কোন ফাঁক না থাকে।

এটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ দরজা এবং এই শরবত অত্যন্ত তিক্ত একটি শরবত। অল্প লোকই এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এবং শরবত পান করে। ব্যভিচার হতে বাঁচা কোন বড় ব্যাপার নয় এবং কাউকেও অন্যায়-ভাবে হত্যা না করা বড় কাজ নয়। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়াও কোন বড় গুণ নয়। ***কিন্তু সব কিছুর উপর খোদাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁর জন্য খাঁটি ভালবাসা এবং খাঁটি আবেগে পৃথিবীর সকল তিক্ততা স্বীকার করা বরং নিজের হাতে তিক্ততা সৃষ্টি করা ঐ মর্যাদা, যা সিদ্দীকগণ (সত্যবাদী) ছাড়া অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। এটা সেই ইবাদত, যা সম্পাদনের জন্যই মানুষ প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে। যে-ব্যক্তি এই ইবাদত সম্পাদন করে, তার এই কর্মের জন্য খোদার পক্ষ হতেও একটি কর্ম সম্পাদিত হয়। এর নাম পুরস্কার।***

(হাকীকাতুল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ৪৪-৪৫ পৃ: থেকে উদ্ধৃত)

জুমুআর খুতবা

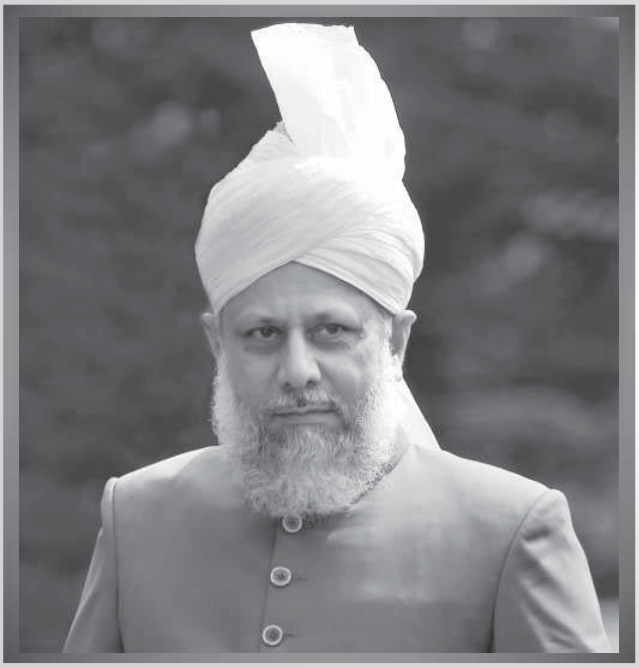

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৯ নভেম্বর ২০১২-এর (৯ নবুয়ত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

এ আয়াতের অনুবাদ হল, 'এবং প্রত্যেকেরই একটি লক্ষ্য রয়েছে, যার প্রতি সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। অতএব তোমরা পুণ্য কর্মে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে একত্র করে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।' (সূরা আল্ বাকারা: ১৪৯)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এমন একটি নির্দেশ দিয়েছেন যা জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির সকল প্রকার উন্নতির জন্য আবশ্যক। অর্থাৎ এমন প্রত্যেক অগ্রগতি যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হয় এবং মুসলমান দাবিকারকদের সত্যিকার মুসলমান বানিয়ে দেয়। এ ছাড়া সামগ্রিকভাবে জামাতের উন্নতির জন্যেও এটি আবশ্যক। আর সে নির্দেশটি হল, পুণ্যকর্মে অগ্রগামী হওয়া যা একজন খাঁটি মু'মিন, একজন প্রকৃত মুসলমান বা প্রকৃত মু'মিনদের জামাতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ বাস করে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেকের জীবনেরই একটি লক্ষ্য রয়েছে, আর তা অর্জনের জন্য সে চেষ্টা করে। কেউ একটি উদ্দেশ্যের পেছনে ছুটছে তো আরেকজন অন্য কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমন কি যারা পাপাচারে লিপ্ত তাদেরও কোন লক্ষ্য থাকে আর তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করে, তা সেটি মন্দ ফলাফল সৃষ্টিকারী হোক বা অন্যের ক্ষতি সাধনের জন্যই হোক না কেন। উদাহরণস্বরূপ, এক চোরের কথাই ধরুন, সে দিনের প্রায় অধিকাংশ সময় এ পরিকল্পনার পিছনে ব্যয় করে যে, রাতে সে কোথায় এবং কীভাবে চুরি করবে। অথবা একজন ডাকাত, ডাকাতি করার পরিকল্পনা করে।

আর এমনও কতক মানুষ আছে যারা পুণ্যকর্ম ও ধর্মের নামে নিপীড়ন-নির্যাতন করাকেই নিজেদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং তা পূরণে বিভিন্ন ফন্দি আঁটে। এ জন্য নিষ্পাপ শিশুদের প্রশিক্ষণ দেয় এবং অর্থ ও সময় নষ্ট করে। সুদীর্ঘ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের মগজধোলাই করে আর তাদের দিয়ে আত্মঘাতী আক্রমন হানে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে নিরীহ মানুষের প্রাণহানী ঘটায়। দুর্ভাগ্যবশত এমন অত্যাচারীদের

অধিকাংশই মুসলমান বলে দাবী করে এবং ধর্মের নামে তারা এসব ফিৎনা-ফাসাদ, নিপীড়ন-নির্যাতন, বর্বরতা ও নিরপরাধ মানুষের রক্তে হোলি খেলছে আর এভাবে তারা ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা এবং মুসলমানদের দুর্নাম করছে। যাদের জন্য এবং যে ধর্মের অনুসারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নির্ধারিত লক্ষ্য হল, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

'অর্থাৎ, **'সকল পুণ্যকর্মে প্রতিযোগিতা করাই তোমাদের লক্ষ্য হোক।'** কোন একটি বিচ্ছিন্ন পুণ্যকর্ম তোমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং সকল প্রকার পুণ্যকর্ম করা এবং সে ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়া তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবেই তোমরা খাঁটি মু'মিন বলে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا

অর্থাৎ, এবং প্রত্যেকেরই একটি লক্ষ্য রয়েছে যার প্রতি সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং নিজের লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করে নেয়।

وِجْهَةٌ অর্থ কোন দিক, পার্শ্ব বা লক্ষ্য; এর একটি অর্থ রাস্তা বা পদ্ধতিও হয়, আবার কোন লক্ষ্য অর্জন করাও হয়। (লিসানুল আরব)

অতএব, একজন মু'মিনের জন্য শর্ত হল, আল্লাহ্ তা'লা যেদিকে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন তারা সেদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং সেদিকেই দেখে। শুধু সেদিকে দেখলেই চলবে না বরং যেদিকে দেখছে সেদিকেও বিভিন্ন পথ যায়, সেগুলোর মধ্যে থেকে সেই পথ অবলম্বন করবে, যে পথ অবলম্বনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন। আর শুধু উদ্‌ভ্রান্তের মত এ পথে চলতে থাকলেই হবে না বরং এ পথে চলার একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে। আর সেই উদ্দেশ্যটি হল, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ -যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। শুধু পুণ্যকর্ম করাই যথেষ্ট নয় বরং এর মান উন্নত করতে হবে। এসব পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতা করতে হবে। শুধু অপরের তুলনায় এগিয়ে যাবার চেষ্টা করাই যথেষ্ট নয় বরং যারা দুর্বল এবং পেছনে পড়ে আছে তাদেরকেও সাথে নিয়ে এগুতে হবে। অর্থাৎ সমষ্টিগত উন্নতির প্রতিও সর্বদা একজন মু'মিনের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। অতএব, সে-ই খাঁটি মু'মিন যে নিজে উন্নতি করে এবং জামাতের অন্য সদস্যদের উন্নতির জন্যেও চেষ্টা করে। পুণ্যকর্মের প্রতিযোগিতায় তাদেরকেও নিজের সঙ্গী বানায়। তাদের জন্যও সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করে, তারাও যেন সামনে এগিয়ে যেতে পারে এবং এভাবে জামাতের উন্নতির চাকা যেন দ্রুত গতিতে ঘুরে ও সচল থাকে। আহমদীয়া জামাত, এমন এক জামাত যারা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক {হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)}-এর সাথে সম্পর্কের কারণে মহানবী (সা.) কর্তৃক আনীত কল্যাণরাজি বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এ কল্যাণের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের বিষয়টিও আছে আর মানবাধিকারও রয়েছে। ইবাদতও এর অন্তর্ভূক্ত, আর সৃষ্টি ও গোটা মানব জাতির সেবাও আছে। কেননা, মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র বিশ্বের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ প্রেরণ করেছেন।

মানব জাতির সেবা হতে পারে পুণ্যকর্ম বিস্তারের মাধ্যমে আর আশিস বিতরণের ফলে। যেভাবে আমি পূর্বে উদাহরণ দিয়ে বলেছি, কতক মানুষ অপকর্ম করে এবং এ কাজের জন্য শিশুদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। নিষ্পাপ শিশুদের প্রাণ হরণ বা তাদের দিয়ে আত্মঘাতি হামলা করানোর মাধ্যমে সেবা প্রদান সম্ভব নয়। বোমা, গোলা বারুদ, যুদ্ধ ও ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে এ সেবা হতে পারে না। কাজেই সংঘবদ্ধভাবে পৃথিবীতে আজ একমাত্র আহমদীয়া জামাতই সমগ্র বিশ্বের আশীর্বাদ (রহমাতুল্লিল আলামীন)-এর কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত করতে এবং পুণ্যকর্মের বিস্তার ঘটাতে সদা সচেষ্ট। আর এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য সব ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। এ চেষ্টা করে যাচ্ছে, ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা ও ইসলামের বাণী বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে, পবিত্র কুরআন প্রকাশনার মাধ্যমে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের ভাষায় কুরআন অনুবাদ করে সেগুলো ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে, বিশ্ববাসীকে উন্নত নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে, বিশ্ববাসীকে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে।

হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে আর্ত মানবতার চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে, দূর-দূরান্তের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত শিশুদের ও মানুষকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার মাধ্যমে, তাদেরকে পুণ্যকর্মের সঠিক জ্ঞান দান করার মাধ্যমে আর সবচেয়ে বড় কথা–

মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সমর্পিত বান্দা বানানোর মাধ্যমেও এ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কাজেই, আহমদীয়া জামাতের উদ্দেশ্য কোন সাধারণ উদ্দেশ্য নয়। যুগ ইমামের সঙ্গে আমরা যে অঙ্গীকার করেছি তা কোন সাধারণ অঙ্গীকার নয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন সেটিকেই আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য স্থির করতে হবে, যে বিষয়ে আমি শুরুতে কিছুটা ব্যাখ্যা করেছি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সেই পথ অবলম্বন করতে হবে যে পথ মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার দিকে নিয়ে যায়। শয়তান যেভাবে বলেছে, এসব পথেও শয়তানের মুখোমুখি হওয়ার আশংকা থাকে, সে পুণ্যকর্ম করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। পুণ্যকর্মের মান উন্নত করার চেষ্টায় বাধ সাধার চেষ্টা করবে কিন্তু মানুষের হৃদয় থেকে উদ্ভূত দোয়া,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ, আমাদের তুমি সহজ-সরল ও সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাঁদের পথে যাঁদের তুমি পুরস্কৃত করেছ, এই দোয়াই শয়তানের আক্রমন নস্যাৎ করবে। একজন মু'মিন পুণ্যকর্মের উচ্চ মার্গে উপনীত হতে থাকবে এবং সর্বোত্তম উম্মতের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে থাকবে। কাজেই এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবার চেষ্টা করতে হবে। সকল প্রকার সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক আমাদের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে এবং এ জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা একজন মু'মিনকে যেসব পুণ্যকর্ম করার নির্দেশ দিয়েছেন তন্মধ্যে একটি হল, 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্' অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা।

ইতিপূর্বে আমি যেসব উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছি সেসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর্থিক কুরবানী করাও একান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ ইসলামের প্রচার-প্রসার ও মানব সেবার জন্য। আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস সাক্ষী, বিগত একশ' পঁচিশ বছর যাবৎ জামাতের সদস্যবৃন্দ এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে

আসছেন। এসব কুরবানী ও পুণ্যকর্ম আহমদীয়া জামাতের এমন এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যা দেখে অন্যরা হতভম্ব ও বিস্মিত হয়। কেননা, এর পিছনে কোন্ প্রেরণা কাজ করছে– তারা আদৌ এর ধারণা বা জ্ঞান রাখে না। একজন আহমদীর মাঝে এ প্রেরণা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হল, সে আল্লাহ্ তা'লার فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ, 'সৎকাজে প্রতিযোগিতা কর'-এ নির্দেশকে নিজেদের জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে।

কাজেই পৃথিবীর বুকে বর্তমানে শুধু আহমদীরাই অর্থাৎ আপনারাই আছেন, যারা

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

{(অর্থাৎ, 'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' (সূরা আলে ইমরান: ১১১)} এর পরিপূরণস্থল হিসেবে আয়াতের فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ -এর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন এবং এর উপর পরিচালিত হবার চেষ্টা করছেন। পুণ্যকাজে অভ্যস্ত হওয়া, সৎকাজে প্রতিযোগিতা, জামাত তথা ইসলামের বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রাণ, ধন-সম্পদ, সময় ও সম্মানের কুরবানী করে যাচ্ছেন। কোন শত্রু বা কোন শক্তি আহমদীয়া জামাতের এ উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না। কোন সরকার বা কোন জাতি আমাদের উন্নতির গতি ততক্ষণ পর্যন্ত মন্থর করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মাঝে فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ -এর শিক্ষা জাগরুক থাকবে। মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিককে মেনে আমরা ইসলামের পুনর্জাগরণের অংশ হওয়ার যে অঙ্গীকার করেছি এই অঙ্গীকার আমাদের পুণ্যকর্মের অগ্রগতিকে কখনোই মন্থর হতে দিবে না, ইনশাআল্লাহ্। পুণ্যকর্মে অগ্রগামী হওয়ার আগ্রহ ও আত্মত্যাগের প্রেরণা দেখে অনেক সময় আমরাও আশ্চর্য হই, আর আমি নিজেও বিস্মিত হই এ জন্য যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ও তাঁর জামাতকে আশ্চর্যজনক ত্যাগের চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং উন্নত পুণ্যকর্মে অভ্যস্ত আর অবিচলতার সাথে সৎকর্মে প্রতিষ্ঠিত নিষ্ঠাবান মানুষ দান করেছেন! যারা ক্রমাগতভাবে এসব কুরবানী করে যাচ্ছেন এবং যারা فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ -এর মর্ম অনুধাবন করেছেন।

فَاسْتَبِقُوا শব্দের অর্থ, ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যেতে থাকা। (লিসানুল আরব)

استباق অর্থ বিরামহীনভাবে অগ্রসর হতে থাকা এবং এজন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা জারী রাখা। এ হল এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। জামাতের সদস্যদের মাঝে এ প্রতিযোগিতা বিভিন্ন পুণ্যকর্মের আদলে পরিলক্ষিত হয়। এসব পুণ্যের মধ্যে একটি হল, আর্থিক কুরবানী। আল্লাহ্ তালা'র অপার কৃপায় জামাতের সদস্যবৃন্দ এ উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন। এদের মধ্যে নবাগতরাও আছেন এবং পুরোনরাও আছেন, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং তুলনামূলকভাবে ধনীরাও আছেন। আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে যাকেই বুঝানো হয়–সে-ই পুণ্যকর্মে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। শুধু বুঝানোর লোকের অভাব। যেমনটি আমি বলেছি, জামাতের অধিকাংশ সদস্যই স্বল্প আয়ের মানুষ– তাই আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই বেশি, যারা নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিয়ে থাকেন।

নিঃসন্দেহে কোন কোন স্বচ্ছল মানুষও অনেক বড় অংকের কুরবানী করে থাকেন। তবে, তারা স্বল্প আয়ের সদস্যদের কুরবানীর মান এবং কুরবানীকারীর সংখ্যার দিক থেকে তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে পাশ্চাত্যে বসবাসকারী আহমদীদের আল্লাহ্ তা'লা অনেক দিয়েছেন। বলা যেতে পারে, আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের একটি বড় শ্রেণীকে নিজ কৃপায় অনেক স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন। তাদেরকে অনেক কিছু দান করেছেন। কাজেই, তাদের কেবল নিজেদের বর্তমান কুরবানীকেই যথেষ্ট জ্ঞান করা উচিত নয় অথবা নিজেদের কুরবানীর অংক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই যথেষ্ট নয়। গত এক বছরে তারা কত কুরবানী করেছেন তার উপর দৃষ্টি রাখলেই হবে না বরং পরের বছর তা বৃদ্ধি পেয়েছে কী-না? যদি অংকের পরিমাণ বৃদ্ধি না পেয়ে থাকে তাহলে তাদের চিন্তা করা উচিত।

যেমনটি আমি বলেছি, (সৎকাজে) প্রতিযোগিতার বিষয়টি সাধারণত আহমদীরা বুঝে এবং তারা এক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে চেষ্টাও করে। জামাতের বিভিন্ন আবশ্যকীয় চাঁদা ছাড়াও অন্যান্য চাঁদার জন্যেও আহ্বান করা হয়। এর জন্য জামাত কুরবানী করে থাকে। কতক তাহরীক করা হয় কোন দেশের স্থানীয় জামাতের চাহিদা পুরণের জন্য, কতক তাহরীক জাতীয় কোন প্রজেক্টের কাজের জন্য করা হয়। অনেক দেশে কেন্দ্রীয় অর্থায়নে মসজিদ নির্মাণ অথবা অন্য কোন প্রজেক্ট-এর কাজ চলছে। কেবলমাত্র লাজেমী চাঁদা থেকে এ প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয় বলে জামাতের সদস্যবৃন্দ অনেক ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন অর্থাৎ, জামাতের অধিকাংশ সদস্য এসব খাতে অর্থ প্রদান করেন।

এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিচ্ছি, ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদ এর চাঁদার সাকল্য অর্থই কেন্দ্রের প্রাপ্য। এ থেকে স্থানীয় বা দেশীয় কোন খাতে খরচ করা যায় না। এ খাতের চাঁদা যদিও কোনো কোনো দরিদ্র দেশে গচ্ছিত রাখা হয় কিন্তু এ সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত তারা নিজেরা নিতে পারে না বরং কেন্দ্রের অনুমতি সাপেক্ষে সেই খাত থেকে খরচ করা হয়ে থাকে। অনেক সময় ধনী দেশের সদস্যদের মনে এ ধারণার উদ্রেক হয়, এ চাঁদা যেহেতু কেন্দ্রের এবং এ অর্থ আমাদের জন্য খরচও করা হয় না তাই আমরা কেন এত গুরুত্ব সহকারে এতে অংশগ্রহণ করবো? তারা বলে, আমাদের নিজস্ব প্রজেক্ট রয়েছে, তাই প্রথমে আমরা আমাদের স্থানীয় ও দেশীয় বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করব (পরে এদিকে দৃষ্টি দিব)।

প্রথম কথা হল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যেহেতু আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করা হয় তাই এমন প্রশ্নের উদয় হওয়াই সঠিক নয়। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রেরও অনেক ব্যয় রয়েছে, দরিদ্র দেশ সমূহে অনেক প্রজেক্ট চলমান রয়েছে, যার মধ্যে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ অন্তর্ভূক্ত; এর মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত প্রভৃতিও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এমনকি ইউরোপের এমন কতক দেশও এর গন্ডিভূক্ত যেখানে জামাতের সদস্য সংখ্যা কম। এসব দেশে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রজেক্টে খরচ করা হয়ে থাকে। তেমনিভাবে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্যও কেন্দ্র শিক্ষাভাতা প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন জামাত থেকে কেন্দ্রে পাঠানো অর্থের দ্বারাই এসব খরচ নির্বাহ করা হয়।

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ -এর মূল কথাই এটি যে, নিজেদের গরীব ভাইদের অর্থাৎ দুর্বল জামাতগুলোকে সাথে নিয়ে চল। আর এভাবে আমরা আমাদের দুর্বল ভাইদের সাথে নিয়ে চলতে চেষ্টা করে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সফলকাম হতে পারি।

আমি যে আয়াত পাঠ করেছি তাতে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ

অর্থাৎ, 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের একত্রিত করে নিয়ে আসবেন'। তোমরা সমবেতভাবে সৎকাজে প্রতিযোগিতা করতে থাকলে এবং পরস্পর প্রতিযোগিতার চেতনাকে সমুন্নত রাখলে সফলকাম হবে। আর যারা আলস্য দেখাবে, এড়িয়ে চলবে অথবা এ প্রশ্ন উত্থাপন করবে যে, আমরা কেন অন্যদের জন্য অর্থ ব্যয় করব, তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। এ রকম প্রশ্ন এক দু'জন করলেও এটি ঐ চেতনা পরিপন্থী যা একজন আহমদীকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে প্রত্যাশা রাখেন।

আমি কেন্দ্রীয় ব্যয়ের কথা বলেছি, এসব খরচের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। যেন আপনারা জানতে পারেন যে, পৃথিবীর সকল জামাতই কিন্তু স্বাবলম্বী নয় বরং অনেক জামাতকে সেসব দেশে গচ্ছিত কেন্দ্রীয় তহবীল হতে বিভিন্ন ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় গ্রান্ট হিসেবে প্রদান করা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আটষট্টিটি দেশ এমন আছে যারা স্বাবলম্বী নয়, যার মধ্যে আফ্রিকার সাতাশটি, ইউরোপের আঠারোটি, এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের পনেরটি, দক্ষিণ আমেরিকার ছয়টি এবং উত্তর আমেরিকার দু'টি দেশ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

আর এ বছর একটি বড় অংক এসব দেশে মসজিদ ও মিশন হাউজ নির্মাণের পিছনে খরচ করা হয়েছে। এছাড়াও ক্লিনিক, স্কুল, রেডিও, টিভি অনুষ্ঠানে-ই প্রায় তিন মিলিয়ন পাউন্ড খরচ হবে। নিয়মিত খরচের বাইরেও কোনো কোনো স্থানে বড় বড় নির্মাণ কাজ চলছে।

আমাদের মিশনারীদের পিছনেও ব্যয় হচ্ছে, আফ্রিকার ৩৫টি দেশে ১৭৮জন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এবং ১০৭৮জন স্থানীয় মুয়াল্লিম কর্মরত রয়েছেন। এদের পিছনে খরচের সিংহভাগ কেন্দ্র নির্বাহ করে থাকে। এছাড়া ৪১টি দেশে কেন্দ্র হতে গ্রান্ট প্রেরণ করা হয়। এসব দেশেও আমাদের মুবাল্লেগের সংখ্যা ২৪৩জন এবং স্থানীয় মুয়াল্লিমের সংখ্যা ৯২৮জন। অনেক মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে।

আয়ারল্যান্ডে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। যদিও আয়ারল্যান্ড জামাত খরচের অনেক বড় একটি অংশ নিজেরাই বহন করছে কিন্তু তারপরও কিছু টাকা অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক টাকা কেন্দ্রকেও দিতে হয়েছে। স্পেনের ভ্যালেনসিয়াতে মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। এর পিছনে ব্যয়ের প্রায় ৮০ শতাংশই কেন্দ্র বহন করছে। উগান্ডার কাম্পালায় মসজিদ সম্প্রসারণের কাজ চলছে, এরও প্রায় পুরো ব্যয় কেন্দ্র বহন করছে।

আইভরীকোস্টে কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। আফ্রিকার ১৯টি দেশে ৯৯টি মসজিদ এবং ৪৭টি মিশন হাউজ নির্মিত হয়েছে। এর মাঝে প্রায় ৬৫টি মসজিদের ব্যয় কেন্দ্র বহন করেছে। অনুরূপভাবে মিশন হাউজেরও ব্যয় বহন করেছে। আরও অনেক দেশ রয়েছে যেখানে ২৬টি মসজিদ এবং ৭০টি মিশন হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর মাঝে বাংলাদেশে ২টি, ইন্ডিয়াতে ৪০টি, ফিলিপাইনে ১টি, নেপালে ৩টি, গুয়েটামালার মার্শাল দ্বীপ প্রভৃতিতে কেন্দ্র ব্যয় নির্বাহ করেছে।

এরপর ৪৫০০ মেধাবী ছাত্রকে জামাত কয়েক লক্ষ পাউন্ড বৃত্তি বা করযে হাসানা হিসেবে দিয়েছে। এদের মাঝে ৩৫০জন এমন ছাত্র রয়েছে যারা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করছে অর্থাৎ এম,এস,সি বা পি,এইচ,ডি করছে, জামাত এসব শিক্ষার্থীর পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করছে। এছাড়াও আফ্রিকাতে পানি, বিদ্যুৎ, রেডিও স্টেশন প্রভৃতি প্রজেক্টের ব্যয়ভারও কেন্দ্রীয় গ্র্যান্ট থেকেই বহন করা হয়।

এসব কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল, জামাতের উন্নতি। বিশ্বকে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এ কাজ করা হচ্ছে। এ সকল কাজ মানবতার সেবার জন্য করা হয়। যারা এসব কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারছেন না তারা চাঁদার মাধ্যমে এতে অংশগ্রহণ করছেন। আর এভাবে তারা সেসব লোকের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছেন, যারা এ ক্ষেত্রে অবদান রেখে আল্লাহ্ তা'লার কাছে পুরস্কারের ভাগী হচ্ছেন।

আফ্রিকান দেশসমূহ্ সম্পর্কে এমন ধারণা করবেন না যে, তারা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের উপরই নির্ভরশীল; নিজেরা কিছুই করে না। যেমনটি আমি বলেছি, অনেক প্রজেক্টের ব্যয়ভার তারা নিজেরাও বহন করেছে। এ প্রসঙ্গে আমি তাদের কুরবানীর কতক ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

ঘানার আপার ওয়েস্ট অঞ্চলের একজন মহিলা নাম ফাতেমা দাউদ সাহেবা। তিনি স্বয়ং জমি ক্রয় করে এতে মসজিদ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করিয়ে দেন, যাতে অনায়াসে তিনশ' মুসল্লী নামায পড়তে পারেন। আক্রা শহরের নিকটে লামনারাহ্ গ্রামে অনেকেই বয়আত করেছেন। সেখানেও জামাতের সদস্যরা নিজ উদ্যোগে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। বরং বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জামাতের জন্য তারা ছয়টি মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেছে এবং ইতোমধ্যে চারটি মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে আর দু'টি নির্মাণাধীন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সাদেকা সাহেবা নামের একজন মহিলা একাই একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছেন। এই মসজিদে ১৫০জন মুসল্লী নামায পড়তে পারেন। এই মহিলা পূর্বে আক্রা শহরেও একটি মসজিদ বানিয়েছেন।

ঘানার মুবাল্লেগ আহমদ জিব্রাঈল সাঈদ সাহেব লিখেন, সেন্টার রিজিওন আকোটসিতেও বড় একটি মসজিদ নির্মিত হচ্ছে আর আমাদের কাকুজান নামে হাই কোর্টের একজন জজ সাহেব এর অর্ধেক খরচ দিয়েছেন।

জিব্রাঈল সাঈদ সাহেব বর্তমানে অসুস্থ আছেন এবং ডাক্তার তার সঠিক রোগ-নির্ণয় করতে পারছে না। তার জন্যও দোয়া করুন, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাকে পূর্ণ আরোগ্য দান করেন।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব মরক্কো সফরে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেন, আমি সেখানকার নতুন বয়াতকারীদের নিষ্ঠা ও ত্যাগের প্রেরণায় সমৃদ্ধ পেয়েছি। খিলাফতের প্রতি তাদের অগাধ ভালবাসা রয়েছে। তাদেরকে আর্থিক কুরবানীর কথা বলা হয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি পড়ে শুনানো হয়। তিনি বলেন, এর কিছুদিন পর এক বন্ধু প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে এসে একটি বড় অংক দেয় এবং বলে, যেদিন বয়আত করেছি সেদিন থেকে হিসেব করে এ হল আমার পুরো চাঁদা। কেননা, আমি পূর্বে চাঁদা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশনা এবং যুগ খলীফার উপদেশাবলী শুনি নি। এখন যেহেতু জেনেছি তাই আর পিছিয়ে থাকতে পারি

না।

নাইজার থেকে আসগর আলী সাহেব লিখেন, তবলীগের উদ্দেশে অধম ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে গিদাব্রাও গ্রামে পৌঁছে। মাগরিবের নামাযের পর তবলীগ করা হয় এবং ইশার নামাযের পর আমার (হুযূরের) বিভিন্ন সফরের ধারণকৃত ভিডিও চিত্র দেখান হয় যাতে জলসা, মসজিদ সংক্রান্ত ক্লিপিং এবং তবলীগি কার্যক্রম সংক্রান্ত ফুটেজও অন্তর্ভূক্ত ছিল। অনুরূপভাবে ইমাম মাহদীর আগমন সর্ম্পকে বলা হয়, বায়তুল মালের ব্যবস্থা সর্ম্পকে অবহিত করি। এসব কথার মাধ্যমে ভিডিও শেষ হয়। তখন একজন ইমাম উঠে দাঁড়ান এবং উপস্থিত 'হাওসা গোত্রের' লোকদের সাথে নিয়ে মসজিদের বাইরে চলে যান। আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম। অল্প কিছুক্ষণ পরই তিনি ফিরে এসে বলেন, আমরা এখন বুঝতে পেরেছি যে, ইমাম মাহদী এসে গেছেন আর বায়তুল মালের ব্যবস্থাপনাও প্রতিষ্ঠিত আছে। আমি তাদের সবাইকে বাইরে নিয়ে যাই একথা বুঝানোর জন্য যে, আমাদের এই ব্যবস্থাপনায় অংশ নেয়া উচিত আর অগ্রণী ভূমিকা রাখা উচিত। অতএব, তারা তাৎক্ষণিকভাবে টাকা সংগ্রহ করে আমাদের মুবাল্লেগের হাতে দেন আর সেইসাথে বয়আত ফরমও পূরণ করেন।

উগান্ডার আমীর সাহেব বর্ণনা করেন, গত বছর ১৮ই সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল আমেলা আর জামাতের কিছু গণ্যমান্য লোকের সমন্বয়ে একটি মিটিং আহ্বান করা হয়। আর 'সীতাল্যান্ড'এর উন্নয়নের জন্য তিন বছর মেয়াদী কর্মসূচী তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়, যাতে এই স্থানটিকে জলসাগাহ্ হিসেবে প্রস্তুত করা যায়। এটি কাম্পালাস্থ জাতীয় প্রধান কার্যালয় থেকে নয় মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে জামাতের ১৭ একর জমি রয়েছে। তিনি বলেন, এ মিটিংয়ে জামাতের অনেক সম্পদশালী বন্ধু তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াদা করেন আর পরিশোধ করতেও আরম্ভ করে দেন। যদিও শিলিং-এর মূল্য কম তবুও তারা নিজেদের সামর্থানুযায়ী স্বল্প সময়ের ভেতর ৮৩ মিলিয়নের অধিক শিলিং একত্রিত করেন, যদ্বারা এই প্রজেক্ট এর কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

কাজেই ধনী দেশগুলোর আহমদীরা মনে করবেন না, এই গরীব দেশগুলো সম্পূর্ণভাবে আপনাদের উপর নির্ভরশীল। বরং তারা সাধ্যানুযায়ী বরং সাধ্যাতীত কুরবানী করে যাচ্ছেন।

যাহোক, আজ আমি আর্থিক ত্যাগ স্বীকার বা আর্থিক কুরবানীর কথা বলছি, কেননা আপনারা জানেন আজ তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করা হবে, আর রীতি অনুযায়ী বিগত বছরের কিছু পরিসংখ্যানও উপস্থাপন করা হবে। এতক্ষণ আমি একজন আহমদীর কুরবানীর মান কেমন হওয়া উচিত তা বর্ণনা করেছি এখন আমি তাহরীকে জাদীদ সংক্রান্ত কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

৩১শে অক্টোবর তাহরীকে জাদীদের ৭৮তম বছর সমাপ্ত হয়েছে। আর ১লা নভেম্বর থেকে ৭৯তম বছর শুরু হয়েছে। প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে জামাত এ বছর তাহরীকে জাদীদ খাতে ৭২লক্ষ ১৫ হাজার ৭০০ পাউন্ড চাঁদা দিয়েছে, (আলহামদুলিল্লাহ্)। আর এটি গত বছরের চেয়ে প্রায় ৫লক্ষ ৮৪ হাজার ৭০০ পাউন্ড বেশি। প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও পাকিস্তান তাদের পূর্বের অবস্থান ধরে রেখেছে। এরপর বহির্বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম, দ্বিতীয় জার্মানী, তৃতীয় যুক্তরাজ্য, চতুর্থ কানাডা, পঞ্চম ভারত, ষষ্ঠ ইন্দোনেশিয়া এরপর সপ্তম স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত। কৌশলগত কারণে নাম উল্লেখ করছি না। অষ্টম অস্ট্রেলিয়া, নবম সুইজারল্যান্ড তারপর বেলজিয়াম। বেলজিয়াম আর ঘানা সুইজারল্যান্ডের প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে আছে।

শীর্ষ দশ'টি বড় জামাতের মধ্যে মুদ্রা মানের নিরিখে আদায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি হয়েছে আরব দেশের উক্ত জামাতটিতে। এরপর অস্ট্রেলিয়া ও ভারত রয়েছে তারপর পর্যায়ক্রমে জার্মানী, আমেরিকা, বেলজিয়াম, কানাডা, ইংল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া আর এরপর ইউরোপের অন্যান্য জামাতগুলোর মধ্যে ফ্রান্স সর্বাগ্রে রয়েছে। মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকেও মধ্যপ্রাচ্যের ঐ দেশটির অবস্থানই প্রথম। তারা মাথাপিছু ১৫৬ পাউন্ড বরং প্রায় ১৫৭ পাউন্ড চাঁদা দিয়েছে। আর আমেরিকা মাথাপিছু ১১৮ পাউন্ড দিয়েছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে সুইজারল্যান্ড, জাপান, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, কানাডা, নরওয়ে, জার্মানী এবং অস্ট্রেলিয়া।

এবছর শুধু অর্থই বৃদ্ধি পায়নি বরং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণকারী নিষ্ঠাবানদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সংখ্যা হল, এক লক্ষ আশি হাজার। এভাবে তাহরীকে জাদীদের মোট চাঁদা দাতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে নয় লক্ষ এগার হাজারে, যা গত বছর ছিল সাত লক্ষ একত্রিশ হাজার।

আফ্রিকার জামাতগুলের মধ্যে মোট চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে ঘানা সর্বাগ্রে রয়েছে। তারপর রয়েছে যথাক্রমে নাইজেরিয়া, মরিশাস, বুরকিনা ফাসো, কেনিয়া, বেনিন, উগান্ডা, তানজানিয়া, গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন। এগুলো যেহেতু দরিদ্র দেশ তাই আমি তাদের নাম পৃথকভাবে উল্লেখ করলাম; কুরবানীর প্রতিযোগিতায় আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা অনেক অগ্রগামী রয়েছে।

আর অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে নাইজেরিয়া শুধু আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যেই নয় বরং বিশ্বের সব দেশের তুলনায় এগিয়ে আছে। এ বছর তারা ৬৪ হাজার ৪১৯ জন নতুন চাঁদা দাতা বৃদ্ধি করেছে। চাঁদা দাতার সংখ্যা এমন অসাধারণ বৃদ্ধির সুবাদে চাঁদা দাতার সংখ্যার দিকে থেকে পাকিস্তানের পর তারা (সারা বিশ্বে) দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তাদের মোট সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি। এভাবে আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে নাইজার, বেনিন, বুরকিনা ফাসো এবং সিয়েরা লিওনের নাম উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে ঘানার এগিয়ে আসার চেষ্টা করা উচিত।

প্রথম দফতরের মোট মুজাহিদের সংখ্যা পাঁচ হাজার নয়শ' সাতাশ জন তাদের মাঝে দুইশ' পঁচাশিজন খোদার কৃপায় জীবিত আছেন যারা স্বয়ং নিজেদের চাঁদা পরিশোধ করছেন। অন্যদের হিসাবও তাদের উত্তরসূরীরা বা অন্য কেউ বহাল রেখেছেন।

মোট চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে যথাক্রমে পাকিস্তানের প্রথম তিনটি জামাত হচ্ছে, লাহোর, রাবওয়াহ্ এবং করাচী। শহুরে জামাতগুলোর ভেতর কুরবানী করার ক্ষেত্রে প্রথম দশটি জামাত হচ্ছে, যথাক্রমে রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদ, শিয়ালকোট, কোয়েটা, সারগোদা, ফয়সালাবাদ, মিরপুর খাস, নওয়াব শাহ্, পেশওয়ার এবং

ভাওয়ালপুর। জেলা পর্যায়ে কুরবানীর ক্ষেত্রে যারা বেশি আর্থিক কুরবানী করেছে যথাক্রমে তারা হল, প্রথম ওমরকোট তারপর শেখুপুরা, গুজরানওয়ালা, বদ্বীন, সাঙ্ঘড়, নারওয়াল, ভাওয়ালনগর, হায়দ্রাবাদ, রহীম ইয়ার খাঁন, মিরপুর

আযাদ কাশ্মীর এবং খানেওয়াল।

আমেরিকার আর্থিক কুরবানীকারী প্রথম পাঁচটি জামাত হচ্ছে যথাক্রমে, লস এ্যাঞ্জেলস, ইনল্যান্ড এম্পায়ার, কলম্বাস ওহাইও, সিলিকন ভ্যালী, ডেট্রয়েট এবং হ্যারিস বার্গ। (চাঁদা) সংগ্রহের দিক থেকে জার্মানীর শীর্ষ জামাতগুলো হচ্ছে যথাক্রমে, কোলন, রোয়েডেমার্ক, নয়েস, কোবলেঞ্জ, ফ্লোরয্হাইম, মাহদী আবাদ, ড্রায়য়েশ, রাওনহাইম দক্ষিণ, ফুলডা এবং ওয়াইন গার্ডেন। দশটি এমারত যা পূর্বে শুধু জামাত ছিল এখন সেখানে আঞ্চলিক এমারত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সংগ্রহের দিক থেকে প্রথম হচ্ছে, হ্যামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফুর্ট, গ্রসগেরাও, ডামস্টাড, উইজবাদেন, ম্যানহাইম, ডিটসনবাখ্, ওফেনবাখ্ এবং রিডস্টাড।

সামগ্রিকভাবে আদায়ের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের যে দশটি জামাত এগিয়ে আছে সেগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে মসজিদ ফযল, নিউ মল্ডেন, ওয়েষ্ট হিল, উষ্টার পার্ক, বাইতুল ফুতুহ্, রেইঞ্জ পার্ক, মস্ক ওয়েষ্ট, চীম, ম্যানচেষ্টার সাউথ, এবং বার্মিংহাম সেন্ট্রাল। রিজিওনের দিক থেকে প্রথম হচ্ছে, লন্ডন রিজিওন, দ্বিতীয় মিডল্যান্ড রিজিওন এবং তৃতীয় নর্থ ইষ্ট। ছোট জামাত সমূহ যেখানে লোকসংখ্যা একেবারেই কম তাদের মাঝে প্রথম হচ্ছে, স্ক্যানথর্প, দ্বিতীয় ব্রমলে, এরপর লুইশ্যাম, বোর্ন মাউথ, লেমিংটন স্পা এবং অক্সফোর্ট।

আদায়ের দিক থেকে কানাডার উল্লেখযোগ্য জামাত গুলো হচ্ছে, ক্যালগরী, এ্যাডমন্টন, পিস ভিলেজ ইষ্ট, সারে ইষ্ট, পিস ভিলেজ সেন্ট্রাল, উডব্রীজ ব্র্যাম্পটন, ফ্লাওয়ার টাউন, মিসিসাগা ওয়েষ্ট, ভন নর্থ, ম্যাপল, মনট্রিল ইষ্ট।

ভারতের প্রথম দশটি প্রদেশ হচ্ছে কেরালা, তামিল নাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশ। আর্থিক ত্যাগ বা কুরবানীতে অগ্রগামী প্রথম দশটি জামাতের মাঝে প্রথম হচ্ছে, তামিল নাড়ুর কোয়েমবাটুর, এরপর যথাক্রমে কেরালার-কেরুলাই, কেরালার-কালিকাট, অন্ধ্রপ্রদেশের-হায়দ্রাবাদ এরপর পঞ্চম কাদিয়ান, ষষ্ঠ কেরালার-কান্নুর টাউন, কলকাতার–পিঙ্গাডি, কেরালার-মাথুটম, চেন্নাই এবং তামিল নাড়ু।

এবার তাহরীক জাদীদ সম্পর্কে বিভিন্ন জামাতের প্রেরিত কিছু ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আমি চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে বলেছিলাম। ঘানায় চাঁদা দাতার সংখ্যা কমপক্ষে এক লক্ষ হওয়া উচিত ছিল। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নি কারণ, সঠিকভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হয় নি। যদি আপনারা সঠিকভাবে দৃষ্টি দিতেন তাহলে সে সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেত।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, ফারাফিনী অঞ্চলের মিশনারী বলেন, একদিন একজন বৃদ্ধা মহিলা মিশন হাউজে এসে আমাদের মুবাল্লেগ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, ফারাফিনী এলাকায় তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সবচেয়ে বেশী কে প্রদান করেন? তাকে বলা হয়, এই এলাকায় আমাদের একজন বন্ধু সাম্বু জাঙ্গ সাহেব সবচেয়ে বেশি চাঁদা প্রদান করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, কত টাকা দেন? তাকে বলা হয় পঞ্চাশ হাজার ডালাসী প্রদান করেন। ইতিপূর্বে এ মহিলা পনেরশ' ডালাসী চাঁদা দিতেন। তিনি বলেন, যদিও আমার এত টাকা চাঁদা দেয়ার সামর্থ নেই কিন্তু তাসত্বেও আমি তার সাথে প্রতিযোগিতা করব এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার তুলনায় বেশি চাঁদা দিব।

স্পেনের আমীর সাহেব লিখেন, ওফাউর রহমান সাহেবা নামক একজন নবদীক্ষিতা আহমদী, তিনি গত বছর আমার তাহরীকে জাদীদের খুতবা শুনে পাঁচশ' ইউরো দেয়ার ওয়াদা করেন এবং তা প্রদানও করেন। তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদানের সময় তাঁকে অন্যান্য চাঁদার কথাও সবিস্তারে জানানো হয় এবং বলা হয়, যেহেতু আপনি নবদীক্ষিতা আহমদী তাই আপনার জন্য কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। যতটুকু দিতে চান দিতে পারেন। কিন্তু, তিনি সেদিন থেকেই চাঁদা আম, জলসা সালানা এবং অন্যান্য চাঁদা নির্ধারিত হারে প্রদান করা আরম্ভ করেন ।

সুইজারল্যান্ড থেকে মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন, নিউ শাট্ল জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী তবলীগ বলেন, আমাদের এক বন্ধু সুইজারল্যান্ডে আসেন এবং রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেন, কয়েক দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট বিভাগ তার আবেদন বাতিল করে দেয়। সে সময় তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা হয়। তার নিকট ব্যাংকে সর্বমোট একহাজার ফ্রাঙ্ক পরিমাণ অর্থ ছিল যা তিনি উকিল এবং অন্যান্য কাজের জন্য রেখেছিলেন। কিন্তু তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা শোনার পর সমস্ত টাকা আল্লাহ্ তা'লার উপর ভরসা করে চাঁদা দিয়ে দেন আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন, সর্বোত্তম অভিভাবক তো তুমিই, তুমিই তো আমাদের অগোছালো কাজ গুছিয়ে থাক। চাঁদার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা করেছেন আর কেবল অদৃশ্য থেকে সাহায্যই করেন নি বরং তার রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য করা আবেদনও গৃহীত হয় এবং তিনি দেশের নাগরিকত্ব লাভ করেছেন। আর এ কাজে কোন উকিল বা অন্যকিছুর প্রয়োজন পড়ে নি।

কিরগিজিস্তান থেকে আমাদের মুবাল্লেগ লিখেন, একজন কিরগিজ বন্ধুর নাম 'জো মারট' সাহেব, ২০০৬ সালে তিনি বয়আত করেন। অত্যন্ত নেকস্বভাবসম্পন্ন যুবক, বয়আতের অনতিপরে আমাদের মুবাল্লেগ চাঁদার ব্যাপারে বুঝানোর জন্য রসিকতার ছলে বলেন, অন্যরা নিজেদের দলভূক্ত করার জন্য টাকা দেয় কিন্তু যারা আমাদের জামাভূক্ত হয় আমরা তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে থাকি। তখন তিনি বলেন, আমি মাসে তিনশ' কিরগিজ মুদ্রা চাঁদা হিসেবে প্রদান করব। কয়েক মাস পর বাড়িয়ে তিনি তা চারশ' করে দেন, এর কিছুকাল পরে আটশ', এর কিছুদিন পর কারো মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ না হয়ে স্বয়ং এক হাজার স্থানীয় মুদ্রা হিসেবে প্রতি মাসে চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন। তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা লেখানোর মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই তিনি বয়আত করেছেন। তিনি তখনই এক হাজার 'সিম' ওয়াদা করেন। এ অর্থ তার আর্থিক অবস্থার নিরিখে অনেক বেশি ছিল। তাকে বোঝানো হয় যে, এখন অল্প দিলেও চলবে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে বাড়াতে পারবেন। অনেক যুক্তি-পাল্টা যুক্তির পর তিনি কিছুটা কমান।

আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, এক নবদম্পতি সিদ্ধান্ত নেয় যে, সন্তান হলে তারা তাদের সন্তানদেরকে ওয়াক্ফ করবেন। তারা তাদের সন্তানের নামও

পছন্দ করে রাখেন কিন্তু মহিলার সন্তান হওয়ার কোন লক্ষণ ছিল না, কয়েক দিন পর তারা তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে দুই সন্তানের নামে চাঁদার রশিদ কাটান। দু'টি নামের মধ্যে একটি মেয়ের এবং অপরটি ছিল ছেলের নাম। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এ কুরবানীর প্রতিদান যেভাবে দিয়েছেন তা হল, কয়েক সপ্তাহ পর তারা জানতে পারেন যে, মহিলা অন্তঃসত্ত্বা এবং জমজ সন্তানের মা হতে যাচ্ছেন। খোদা তা'লা তাদেরকে জমজ সন্তান দান করেন। স্বামী-স্ত্রী নিশ্চিত, আল্লাহ্ তা'লা তাদের যে জমজ সন্তান দান করেছেন এর কারণ হল, তারা দু'সন্তানের নামে চাঁদা দিয়েছেন।

ভারত থেকে একটি রিপোর্ট এসেছে, সেখানকার কোয়েমবাটুর জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা সাধ্যাতীত পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে আল্লাহ্ তা'লা নিজ সন্নিধান থেকে আমাকে দু'টি ঈমান উদ্দীপক দৃশ্য দেখিয়েছেন। আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে অঙ্গীকার পালনের জন্য লাগাতার দোয়ায় রত ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার দোকানে আসে আর আমার কাছে যেসব সামগ্রী ছিল তা তিনি এর বাজার দরের চেয়ে অনেক বেশি মুল্য দিয়ে কিনে নেন। ফলে সে মুহূর্তেই আমার অঙ্গীকার রক্ষার সুযোগ হয়। তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে আমাদের এলাকার গুদামে হঠাৎ আগুন লেগে যায় যেখানে খাকসারের মালপত্রও রাখা ছিল। অধম দোয়া করতে করতে সেখানে পৌঁছে এবং দেখে হতভম্ব হয়ে যায়, যেখানে অন্যান্য বেপারীর মালপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে অথচ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার মালপত্র সম্পূর্ণভাবে অক্ষত ছিল। আগুন এতই ভয়াবহ ছিল যে, গুদামের লোহার ছাদও গলে গেছে। এ এলাকাটি বিদ্বেষী মুসলমানদের আখড়া ছিল, যারা সর্বদা আমাদের বিরোধিতায় লেগে থাকে কিন্তু এ ঘটনার পর তারা সবাই আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন আরম্ভ করে। এটি কেবলমাত্র চাঁদা দেয়ার কল্যাণে হয়েছে। আমি যখনই এ ঘটনা স্মরণ করি তখন আমার হৃদয় খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়।

এরপর তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর আহসান বশীর উদ্দীন সাহেব লিখেন, তিনি লাকশাদীর কাওয়ারতী জামাতে পৌঁছেন। সেখানকার আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি তরবিয়তী সভায় অধম তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং এর আশিস সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তৃতা করি। জলসার পর উপস্থিত বন্ধুরা তাদের ওয়াদা বাড়িয়ে লেখান। সভায় পর্দার আড়ালে মহিলারাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেন, দ্বিতীয় দিন সেখান থেকে অন্য এক শহরে গেলে আমীর সাহেবের প্রতিনিধি ফোনের মাধ্যমে জানান, এক আহমদী মহিলা মোহতরামা বিবি সাহেবা অভিযোগ করেছেন যে, পুরুষদের কাছ থেকে তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা নেয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের অর্থাৎ মহিলাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। আমি আজ তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছি। আমি যে ওয়াদা লিখিয়েছি তা অপর্যাপ্ত তাই আমার ওয়াদা দ্বিগুণ করে লেখাতে চাই। উল্লিখিত মহিলা অত্যন্ত নেক এবং নিষ্ঠাবতী আহমদী। ছয় বছর পূর্বে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন।

তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ শিহাব সাহেব লিখেন, অন্ধ্রপ্রদেশেস্থ সেকেন্দারাবাদ জামাতের একজন মুখলেস মহিলা তাহরীকে জাদীদ খাতে আর্থিক কুরবানীর একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। উল্লিখিত মহিলার স্বামী গত বছর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ঋণগ্রস্ত হবার কারণে তার জন্য তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে আবার কিছু দিনের মাথায় তাদের মেয়েরও বিয়ে হবার কথা ছিল। তাহরীকে জাদীদের সেক্রেটারী সাহেব তার স্ত্রী'কে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদানের তাগাদা দিলে উল্লিখিত মহিলা তৎক্ষণাৎ চাঁদা প্রদান করে বলেন, আমার স্বামীর কাছে এর উল্লেখ করবেন না কেননা এ টাকা আমি আমার মেয়ের বিয়ের উপহারাদি থেকে তার অনুমতি সাপেক্ষে প্রদান করেছি। (এমন ত্যাগী লোকদের তৎক্ষণাৎ স্থানীয় জামাতের সাহায্য করা উচিত)।

আহমদীয়া জামাত, কোয়েমবাটুর এর দু'জন নিষ্ঠাবান আহমদী যুবক যৌথভাবে ব্যবসা করেন। তারা লিখেছেন, গত বছর তাহরীকে জাদীদ খাতে আমাদের দু'জনের ওয়াদা ছিল মাথাপিছু দশ হাজার রুপী। এ বছর আমরা দু'জন আমাদের ওয়াদা বাড়িয়ে এক লক্ষ রুপী করে লিখিয়েছি। তারা আমাকেও দোয়ার জন্য লিখেছে, যেন এ ওয়াদা রক্ষার সামর্থ্য লাভ করতে পারে। তারা বলেছে, ব্যবসা চরম মন্দা যাচ্ছিল এজন্য খুবই চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করেছেন, এমন এক ব্যবসা হয়েছে যাতে মোট দু'লক্ষ বিশ হাজার রুপী মুনাফা হয়েছে এবং তারা দু'জন তাদের প্রতিশ্রুত অংক সম্পূর্ণ পরিশোধ করে দিয়েছেন।

রাজস্থানের সুমাড়া সার্কেলের এক যুবতী আহমদী মহিলা মুসমাতু জামিরি বেগম, গ্রামবাসীর ছাগপাল চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তার কাছে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা চাওয়ার পর তিনি ছাগল চরিয়ে যে পারিশ্রমিক পান এবং যা কিছু তার থলিতে আগে থেকেই ছিল এর পুরোটাই সে সময় তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন। আমি পূর্বেই বলেছি, ধনীদের তুলনায় গরীবদের কুরবানীর মান অনেক উন্নত।

এমনিভাবে কোটাহ্ সার্কেলের অন্তর্গত আহমদীয়া জামাত, নামানাহ্‌র একজন নবাগতা আহমদী মহিলাকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দিতে বললে তিনি তার ১৪বছর বয়স্কা কন্যাকে বলেন, পঞ্চাশ রুপী দিয়ে দাও। মেয়ে উত্তর দিল, আমার কাছে ১০০ রুপী আছে, আমি পুরোটাই চাঁদা দিব। অতএব, মায়ের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মেয়ে ১০০ রুপীই চাঁদা হিসেবে প্রদান করে। এটিও ভারতের ঘটনা।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ভারতেও আর্থিক কুরবানীর মান ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কেন্দ্র যদিও সেখানে যথেষ্ট খরচ করে তাসত্ত্বেও তারা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব কুরবানীকারীর ধন-সম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দান করুন। সম্পদশালী জামাতগুলো দুর্বল ভাইদের এবং ছোট জামাতগুলোকে সর্বদা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং জামাতের উন্নতির প্রেরণাকে দৃঢ় করতে প্রয়াসী হোন। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জগতময় ছড়িয়ে পড়ুক- আল্লাহ্‌র কাছে আমি এ দোয়াই করি। আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হলেই জগতে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছাতে সক্ষম হব। আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের দোয়া, মুসলিম উম্মাহ্ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিককে চিনতে সক্ষম হোক, যেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকা সমগ্র জগতে উড্ডীন থাকে। (আমীন) এর ফলশ্রুতিতেই জগতে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এবং ভালাবাসার এক পরিবেশ গড়ে উঠবে।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

ইসলাম কি বিশ্বশান্তির জন্যে ভীতির কারণ?

পোলান্ডের ওয়ারশ' বিশ্ববিদ্যালয় সেমিনারে উপস্থাপিত বক্তব্য

মৌলানা আতাউল মুজিব রাশেদ, ইমাম, মসজিদ ফযল, লন্ডন।
ভাষান্তর : মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

[পোল্যান্ড-এর ওয়ারশ' বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল ষ্ট্যাডিজ ফ্যাকাল্টির ডীন প্রফেসর মিঃ সোলান্টা সিয়েরাকোস্কা ডিন্ডো-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে লন্ডনের মসজিদ ফযল-এর ইমাম মৌলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব ইংরেজী ভাষায় যে বক্তৃতা প্রদান করেন নিম্নে তা ভাষান্তরিত করে পত্রস্থ করা হলো]

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দু'টি ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরা যেতে পারে। এদের একটি হচ্ছে, পোল্যান্ড-এর কোন নাগরিক এটা পছন্দ করে না যে, তাদের দেশটির শান্তি ও স্থিতিশীলতা কোন প্রকার ভীতির সম্মুখীন হোক। দ্বিতীয়তঃ, এর মধ্যে ভয়ের যে উপাদানটি রয়েছে, তা হচ্ছে, বিশ্বে ইসলাম ও এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও সাংঘর্ষিক রূপ তাদের লালিত দেশটির মধ্যেও ভীতিকর অবস্থা সঞ্চার করতে পারে। তাদের দেশ-প্রেমের পূর্ণ প্রশংসা করার পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে তাদের আশঙ্কার প্রতিও সংক্ষেপে আমি কিছু আলোকপাত করতে চাই।

ইসলাম সম্পর্কে দু'টো ভিন্ন-উপলব্ধি রয়েছে। একটি হচ্ছে ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম বাস্তব চেহারা, যে-সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করবো। অন্য প্রতিমূর্তিটি হচ্ছে সেটা, যেটা আজকাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে। আলোচ্য বিষয়টি সম্ভবতঃ ইউরোপীয় মিডিয়া প্রচারিত সেই ইসলাম-এর উপলব্ধি-বোধ এরই সাথে সম্পর্কিত। আমার অনুমান যদি সঠিক হয়, তবে আমি বলতে চাই, আপনারা যদি সেই ইসলাম সম্পর্কে ভীত হন, যেটা সন্ত্রাসবাদ এবং বিস্ফোরণ ও আত্মঘাতি বোমা দ্বারা নিরীহ লোকদের রক্তপাত ঘটানোর জন্যে দায়ী, অথবা ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ঘৃণা ও শত্রুতার পসার ঘটায় এবং শক্তির সাহায্যে এর বার্তাকে প্রসারিত করতে চায়, অথবা কতিপয় চরমপন্থী তাদের গোড়ামীপূর্ণ মতবাদ ও আচরণের কারণে ইসলামের নামে এসব নৃশংসতা সাধন করে, অথবা মুসলিম দেশে বসবাসকারী অমুসলিমদের উপর শরিয়া-আইন প্রয়োগে বিশ্বাস করে, অথবা মৌলিক মানবাধিকারকে অগ্রাহ্য করে এবং মহিলা ও অমুসলিমদের সাথে ভয়ঙ্কর আচরণ করে, তাদেরকে অত্যাচার ও অপমানের শিকার বানায়; এসব যদি আপনাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকে এবং ইসলাম সম্পর্কে এই ধারণার উপর ভিত্তি করে আপনারা যদি মনে করেন যে, পোল্যান্ড তথা অন্যান্য দেশের জন্যে ইসলাম হচ্ছে এক বিপদসঙ্কেত, তাহলে সত্যিকারভাবেই আপনারা সমর্থনযোগ্য। কেবল আপনারাই নন, বরং আমি বলব, বিশ্বের সব মানুষেরই এ ধরনের এক ইসলাম দ্বারা শঙ্কিত হবার যথার্থ অধিকার রয়েছে। আমার নিজেরও উচিত এ ধরনের 'বর্বরোচিত ইসলাম'-কে ঘৃণা করা এবং এ থেকে দূরে সরে যাওয়া।

যাহোক, আপনাদেরকে এব্যাপারে আমি নিশ্চিত করতে চাই যে, এটা হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে 'লজ্জাজনকভাবে বিকৃত এক ধারণা', সঠিক ও বাস্তব ইসলামের সাথে যার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম হচ্ছে কেবলই উপরোল্লেখিত যাবতীয় মন্দ-বিষয়াদীর বিপরীত এক ধর্ম।

নিশ্চিতভাবেই এটা বুঝতে হবে যে, আসল ইসলাম হচ্ছে সেই ধর্ম, যেটার উল্লেখ মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে রয়েছে এবং যেটা ইসলামের পবিত্র নবী (সা.) এর মহান ব্যবহারিক জীবনাচরণ দ্বারা সমর্থিত। সেটার বিপরীত এবং বিরোধী কোন কিছুই ইসলাম নয়। অতএব, ইসলামের আসল-শিক্ষা এবং তাদের সেসব মনগড়া ব্যাখ্যাকৃত মত ও আচরণের মধ্যে আপনাদেরকে সুস্পষ্ট-পার্থক্য করতে হবে, যারা ইসলামের নামের বিকৃতি ঘটাচ্ছে।

এটা খুবই দু:খজনক যে, এ যুগে এক বৃহৎজনসমষ্টি ইসলামের সৌন্দর্যকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসলাম হচ্ছে হীরক-সদৃশ স্বচ্ছ-সুন্দর এক শান্তি। যে-কোন আঙ্গিক থেকেই এটাকে দেখা হোক না কেন, এটা হচ্ছে অবিমিশ্র-শান্তি, খাঁটি শান্তি

এবং শান্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিসে ইসলামকে 'একটি শান্তির ধর্ম' বানায়? ধর্মের সার্বিক ইতিহাসে প্রথমবারের মত ইসলামের যথার্থ নামটিই হচ্ছে অনুপম, ধর্মটির এমন একটি নাম দেয়া হয়েছে, আক্ষরিকভাবেই যার অর্থ হচ্ছে 'শান্তি'। এর আরেকটি অর্থও রয়েছে, যা হচ্ছে, খোদার ইচ্ছা ও আদেশের ওপর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

যে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থেই ইসলামে বিশ্বাস করে, তাঁকে মুসলমান বলে। খাঁটি-মুসলমানের একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দান করেছেন ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি (সা.) বলেন :

'*একজন মুসলমান হচ্ছে সে-ব্যক্তি, যার হাত এবং যার জিহ্বা থেকে সব মানুষই সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ*' (সুনান নিসাই, খন্ড-৮, কিতাবুল ঈমান)। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আজকের দিনে ইসলাম 'সন্ত্রাস ও রক্তপাতের ধর্ম' হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে, এবং এক বৃহৎসংখ্যক জনগোষ্ঠি এটাকে প্রকৃতপক্ষে এমন এক ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করে, যে-ধর্ম মানুষে-মানুষে এবং জাতিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণার বিস্তার ঘটায়। প্রকৃত ঘটনা হলো, ইসলাম হচ্ছে শান্তির সবচে' বড় সমর্থক এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সব যুগের শান্তির সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক, সমগ্র মানবজাতির জন্যে শান্তির বাণী বিস্তারকারী।

এসব বিষয়ে পবিত্র কুরআন কী বলে, সে বিষয়ে আমি আলোচনা করতে চাই। ইসলাম যে প্রকৃতপক্ষেই **'শান্তির বার্তা'**; ঘৃণা, সন্ত্রাস, হিংস্রতা অথবা রক্তপাতের বার্তা হবার-চাইতে বহু যোজন দূরে, তা বুঝতে এ আলোচনা আপনাদেরকে সাহায্য করবে।

ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণের স্বাধীনতা :

পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম এ জোরালো বিবৃতি দান করে :

'*ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই*' (২ : ২৫৭)

এ আয়াত স্পষ্টভাবে এ ঘোষণা দেয় যে, সমগ্রবিশ্বের সকল মানুষই তাদের নিজ ধর্ম-পছন্দ করতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, তারা যে ধর্মই পছন্দ করবে, যে ধর্মের আজ্ঞানুবর্তী হয়ে তারা সুখী হবে, সেধর্মই তারা প্রতিপালন করবে। পৃথিবীর বুকে এমন ব্যক্তি নেই, যে কোনভাবে কাউকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করবে অথবা সেজন্যে শক্তি প্রয়োগ করবে। পবিত্র কুরআনই এ ঘোষণা দেয় যে, বিশ্বাসের স্বাধীনতা হচ্ছে সব মানুষের মৌলিক অধিকার। পছন্দমাফিক যে-কোন ধর্মেই তারা বিশ্বাসস্থাপন করতে পারে এবং তাদের পছন্দ মোতাবেক তারা যে কোন ধর্মেরই আজ্ঞাবাহী সদস্য হতে পারে।

পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে :

'*এবং বল, এটা হচ্ছে তোমার প্রভুর কাছ থেকে আগত সত্য, সে কারণে যে চায়, এতে বিশ্বাস করুক এবং যে চায়, অবিশ্বাস করুক*' (১৮ : ৩০)

ইসলাম হচ্ছে এক সুস্পষ্ট সত্য; যারা এতে বিশ্বাস করতে পছন্দ করে, তাদেরকে তা করতে দাও, এবং যারা এতে বিশ্বাস করতে চায় না, তাদেরকে সেটা অগ্রাহ্য করতে দাও। ধর্মের বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এটাকে পছন্দ করার ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীনতা দান করা হয়েছে। ইসলামের এমন কোন অস্ত্র নেই, যা দিয়ে কোন মানুষকে জবরদস্তি করে ধর্মান্তরিত করা যায়।

ধর্ম-ত্যাগের শাস্তি :

দুর্ভাগ্যক্রমে কতিপয় মুসলমানসহ কিছু লোক মনে করে, শিরোচ্ছেদ-ই একজন ধর্ম-ত্যাগীর শাস্তি হওয়া উচিত। মহানবী (সা.)-এর আচারিত বাস্তব নমুনা সম্পূর্ণভাবেই এর বিপরীত। পবিত্র কুরআনের কোথাও এ উল্লেখ নেই যে, হত্যা করাই হচ্ছে ধর্ম-ত্যাগের শাস্তি। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা হচ্ছে : '*ঐ সব লোক, যারা ঈমান আনার পর কুফরী করে, তারপর-আবার ঈমান আনে, অত:পর পুনরায় কুফরী করে এবং কুফরীতে বেড়ে যায়, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনোই ক্ষমা করবেন না, অথবা তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবেন না*' (৪ : ১০৮)।

ধর্মত্যাগের শাস্তি যদি মৃত্যুদন্ডই হতো, তবে কিভাবে একজন লোক, যে ধর্মত্যাগ করেছে, সে দ্বিতীয়বার ইসলামের ছায়াতলে প্রত্যাবর্তন করতে পারতো? পবিত্র কুরআন পরিস্কারভাবে বর্ণনা করে যে, একজন মুসলমান, যে কোন কারণে ধর্মত্যাগ করে, পুণরায় তার পূর্ব ধর্মে ফিরে যেতে পারে, যদি সে তেমনিটি চায়। ফেরত আসার পথ অবলম্বন করার উপায়টি সর্বদাই উন্মুক্ত আছে। ধর্মত্যাগের জন্যে যেভাবে পার্থিব কোন শাস্তির ব্যবস্থা নেই, তেমনিভাবে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করানো এবং তাতে তাকে সারা জীবন আটক করে রাখার বাধ্যবাধকতার কোন উপাদানও ইসলামে নেই।

ইসলামের বিধান মতে ধর্ম হচ্ছে নিজ পছন্দের একটি বিষয়। মানুষ যদি ইসলামের সত্যতা যথযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং এর শিক্ষার ব্যাপারে সন্তুষ্টচিত্ত থাকে, তবে ইসলামে যোগদানের জন্যে তাদেরকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানানো হবে; কিন্তু ইসলাম গ্রহণে যদি তারা মনস্থির না করে, তাতে তাদের উপর কোনই জবরদস্তি নেই। এমনকি ইসলাম গ্রহণের পরও চাইলে তারা এটাকে ত্যাগ করতে পারে। সর্বশক্তিমান খোদা পরকালে এটাকে তাঁর নিজ হাতে গ্রহণ করবেন, কিন্তু ধর্মত্যাগের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করার কোন অধিকার ইহজগতে কারোরই নেই।

ঈশ্বরনিন্দার শাস্তি :

পরবর্তী যে প্রশ্নটি প্রায়শ:ই জিজ্ঞেস করা হয়, সেটা হচ্ছে-ইসলামে ঈশ্বরনিন্দার শাস্তির বিষয়। দুঃখজনক ভাবে অনেক মুসলমান সহ অনেক মানুষই একথা বলে এবং বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর-নিন্দার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড। এ ধরনের দাবী সম্পূর্ণ ভুল।

পবিত্র কুরআনের কোথাও নেই যে, ঈশ্বরনিন্দার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড, অথবা এমনকি এর চাইতে গৌণ কোন শাস্তিরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঘটনাক্রমে, এ অপরাধের জন্যে পার্থিব কোন শাস্তির বিধানও নেই। ইসলামের বিধান মোতাবেক ঈশ্বর-নিন্দা হচ্ছে খুবই জঘন্য এবং অপরাধমূলক এক কাজ, কিন্তু এ অপরাধের শাস্তি সম্পূর্ণরূপে সর্বশক্তিমান নিজ হাতে রেখেছেন। এ ধরনের অপরাধীকে তিনি এ জীবনেও শাস্তি দিতে পারেন অথবা পরজগতেও। আমরা বিশ্বাস করি, প্রত্যেক মানুষই খোদার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সর্বশক্তিমান খোদা বিচার দিবসে প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন, কিন্তু ইহজগতে তিনি কাউকেই এ বিষয়ে

কোন শাস্তির বিধান করার অধিকার কাউকে দান করেননি।

অন্যান্য ধর্মের সাথে সম্পর্ক :

অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে আচরণের বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা নিয়ে অন্য আরেকটি প্রশ্ন অনেকের মনে পীড়া দেয়। ইসলাম কি মুসলমানদেকে অন্যধর্মের অনুসারীদের প্রতি ঘৃণা করতে না'কি সম্মান ও দয়া প্রদর্শন করতে শিক্ষা দেয়?

এ বিষয়ের উপর পবিত্র কুরআন প্রচুর পথনির্দেশনা দান করে। পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে :

'বল, হে আহলে কিতাব! আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে সমশিক্ষাপূর্ণ একটি নির্দেশের দিকে এসো-যা হচ্ছে, আমরা কেবল এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি, এবং আমরা তাঁর সাথে আর কাউকেই শরীক করি না, এবং তাঁকে ছাড়া আমরা আর কাউকেই প্রভু-প্রতিপালক বলে মান্য করি না' (৩ : ৬৫)।

একই বিষয়ে পবিত্র কুরআন আরও বর্ণনা করে :

'এবং ন্যায়-পরায়ণতা ও ধার্মিকতায় পরস্পরকে সাহায্য কর, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘণে পরস্পরকে সাহায্য করো না' (৫ : ৩)।

ধর্মের কোন উল্লেখ এখানে করা হয়নি। পবিত্র কুরআন বলে, তোমাদের উচিত, সর্বদাই প্রত্যেক সৎকর্ম ও মহৎ-উদ্দেশ্যের আহ্বানে যোগদান করা, সে আহ্বান যদি কোন ইহুদী, খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ অথবা যে কোন ধর্মের অনুসারী, এমন কি নাস্তিকের তরফ থেকেও আসে, ইসলাম মুসলমানদেরকে এ ধরণের লোকদের আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং তাদের সাথে সহযোগিতা করারও আবশ্যকতা বোধ করে। তাদের উচিত কেবল সেই কারণটির প্রতিই তাকানো, যে জন্যে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে; কে আহ্বান করছে, সেদিকে নয়।

ইসলাম সোনালী এক নীতি নির্ধারণ করেছে, যা সকল মানুষই অনুসরণ করতে সক্ষম এবং তা থেকে সবাই উপকৃত হতে পারে। ইসলাম এ শিক্ষা দান করে যে, সব আচরণের ভিত্তি সর্বদাই ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে :

"হে যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে স্থির-সংকল্প হও, সাক্ষ্যদানে নিরপেক্ষতা বজায় রাখো, এবং মানুষের শত্রুতা যেন তোমাদের ন্যায়-বিচারহীন কোন কাজে প্ররোচিত না করে। সর্বদাই ন্যায়পরায়ণ হও, সেটাই হচ্ছে সততার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ অবশ্যই অবগত আছেন' (৫ : ৯)।

একথা এটাকে পর্যাপ্তভাবে খোলাসা করেছে যে, ইসলামের প্রকৃত অনুসারীদের ওপর এটা নির্ধারিত করা হয়েছে যে, শত্রুদের সাথেও তারা ন্যায্যতার নিরিখে আচরণ করবে। এমন একটি ধর্ম, যা ঐক্য ও সহযোগীতার অনুপম শিক্ষার বিস্তার ঘটায়, সেই ধর্মের এমন কোন সম্ভাবনা আছে কি যে, অন্য লোকদের বিরুদ্ধে কখনো সহিংসতা অথবা ঘৃণার বিস্তার ঘটাবে?

দেশের আইনের প্রতি অনুগত :

ইসলাম ধর্মে দেশের আইনের প্রতি অনুগত থাকা ধর্মীয় একটি কর্তব্য। পবিত্র কুরআন মুসলমানদেরকে কেবল আল্লাহ্ ও পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিই নয়, বরং তারা যে কর্তৃপক্ষের অধীনে বসবাস করে, তার প্রতিও বিশ্বস্ত থাকতে নির্দেশ দেয়। পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে :

'হে যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী, তাদেরকে মান্য কর' (৪ : ৬০)।

এই কর্তব্যটির বিষয়ে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বিশদ ব্যাখ্যা দান করেছেন, তিনি বলেন :

'একজন খাঁটি মুসলমান তার প্রতিবেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধে অথবা সমকালীন শাসক-গোষ্ঠির অথবা সরকারের বিরুদ্ধে কখনোই বিদ্বেষপ্রসূত-ঘৃণাসূচক আওয়াজ উঠাতে পারে না। একজন খাঁটি মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে, সে যে দেশের নাগরিক, সেদেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং দেশটির আইন পূর্ণভাবে মেনে চলা' (২০০৩ সনের অক্টোবর মাসে মর্ডেনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ)।

জিহাদ কি?

'জিহাদ' হচ্ছে একটি আরবী শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে, 'কোন মহৎ উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা'। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ যখন মানুষকে কোন জিহাদে নিযুক্ত হবার নির্দেশ দান করেন, সেটা এক মহৎ উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করার প্রতি মানুষের মনযোগ আকর্ষণ করাকেই বুঝায়। ইসলামের মতে জিহাদ অনেক উপায়েই চালানো যেতে পারে, যার সবগুলোই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উহার বিস্তার করতে চাওয়াকে বুঝায়।

সর্বাপেক্ষা মহান জিহাদ হচ্ছে–অতি লোভ, কামলালসা এবং অন্যান্য বৈশ্বিক-আকাঙ্খার মত স্বার্থপরতাপূর্ণ আকর্ষণীয় আকাঙ্খার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এজন্যে প্রত্যেকের জন্য আবশ্যকীয় হলো বেশী বেশী আত্ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এ দায়িত্ব সব যুগের সব মুসলমানের উপরই ন্যস্ত করা হয়েছে।

কোন দমন-নীতি গ্রহণ, অথবা শক্তি প্রয়োগ ব্যতিরেকে বিজ্ঞতা, সহিষ্ণুতা এবং অন্যের প্রতি ও তাদের বিশ্বাসের প্রতি সম্মানের সাথে ইসলামের বাণী প্রচার করাও হচ্ছে এক প্রকারের জিহাদ।

বর্ণ, ধর্মমত অথবা গোত্র নির্বিশেষে সব অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য করাও হচ্ছে আরেক প্রকারের জিহাদ, যা কেবল মানবজাতির দুঃখ-কষ্ট দূর করতে সাহায্য করে না, বরং ধনী ও দরিদ্রদের মাঝে বিশেষ সামাজিক-শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে।

আরেক প্রকারের জিহাদ হচ্ছে আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হওয়া। এটা কেবল কতিপয় নির্ধারিত অবস্থাতেই ঘটতে পারে। আত্মরক্ষায় মুসলমানরা কেবল তখনই অস্ত্রধারণ করতে পারে, যদি তারা অত্যাচারিত হয়, তাদের জীবনের প্রতি ভীতিপ্রদর্শন করা হয় এবং কেবল ধর্মপালনের কারণেই তাদেরকে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করা হয়।

ইসলামের নবী (সা.) যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, মক্কার লোকেরা তাঁকে এবং তাঁর

সাথীদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি, বরং বার বার তাঁকে আক্রমণ করে এবং প্রায় সবগুলো যুদ্ধই মদিনার নিকটবর্তী অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল। কে ছিল আক্রমণকারী, তার ইঙ্গিত এ থেকেই পরিস্কারভাবে পাওয়া যায়।

এটা লক্ষ্যনীয় যে, ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের এ অনুমতি কেবল তখনই দেয়া হয়েছিল, যখন তারা আসলেই আক্রান্ত হয়েছিল। সম্মান, সম্পদ, জীবন এবং ধর্মের প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার জন্যেই তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে :

'যুদ্ধ করার অনুমতি তাদেরকেই দেয়া হলো, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল, কারণ তারা অন্যায়ের শিকার হয়েছিল, আর তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা আল্লাহ্‌র রয়েছে' (২২ : ৪০)।

এ অনুমতির ক্ষেত্রেও ইসলামের মানবিকতাপূর্ণ উদার শিক্ষার দিকে তাকিয়ে দেখুন, যাতে বলা হয়েছে যে, এই অনুমতির অপব্যবহার করে কখনোই সীমালঙ্ঘন করা যাবে না।

পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে :

'যে ব্যক্তি তোমার বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করে, সীমালঙ্ঘনের কারণে তাকে ঠিক সেই পরিমাণ শাস্তিই দাও, যে পরিমাণ সীমালঙ্ঘন সে তোমার বিরুদ্ধে করেছে। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ তাদেরই সাথে আছেন, যারা - তাঁকে ভয় করে' (২ : ১৯৫)।

শান্তির মহান সমর্থক হিসেবে ইসলাম এটা নিশ্চিত করেছে যে, আগ্রাসনের জবাব দেয়ার অনুমতি যদিও মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে, তথাপি তাদেরকে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, আগ্রাসীরা যখনই তাদের শত্রুতা বন্ধ করবে এবং যুদ্ধ-বিরতির আকাঙ্খা পোষণ করবে, মুসলমানদেরকে তৎক্ষণাত তাদের রক্ষণাত্মক যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজী হতে হবে, তা সে সময় তারা জয়লাভ অথবা অপরাজিত হবার অবস্থাতেই থাকুক না কেন। পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে :–

'কিন্তু যদি তারা বিরত হয়, তবে স্মরণ রাখবে যে, আগ্রাসী ব্যতিত অন্য কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি নেই' (২ : ১৯৪)।

একজন মুসলমানের এটা স্মরণ রাখা জরুরী যে, কেবল রক্ষণাত্মক-যুদ্ধই হতে পারে, আক্রমণাত্মক যুদ্ধ কখনোই করা যাবে না। এ বিষয়টি পুনর্নিশ্চিত করে পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে : *'আল্লাহ্‌র কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, কিন্তু সীমালঙ্ঘণ করো না। অবশ্যই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না'* (২ : ১৯১)।

আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রয়োজন যদি উদ্ভূতই হয়, সেক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে ইসলাম এ নির্দেশ দিয়েছে যে, কি করতে হবে, আর কি করা যবে না; উদাহরণস্বরূপ–সেসব অসামরিক ব্যক্তি, যারা সক্রিয়ভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না, তারা আক্রান্ত হবে না; সেসব সম্পদ, যেমন–শস্য অথবা খাদ্যের অন্যান্য উৎস, এবং পানি, হাসপাতাল, এতিমখানা, ইবাদতের স্থানগুলো (সব-ধর্মের) ধ্বংস করা যাবে না এবং মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ এবং পঙ্গুদেরকে অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। অতএব, এটা খুবই স্পষ্ট যে, এ ধরনের যে কোন যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'শান্তি স্থাপন করা' এবং 'আগ্রাসনের বিস্তার না করা'। সব ধরনের জিহাদের অর্থই হচ্ছে নিজেদের ও সমাজের মধ্যে শান্তি বিস্তার করা। শান্তি বিস্তার করে না, এমন কোন কাজকেই জিহাদ আখ্যায়িত করা যায় না।

সন্ত্রাসবাদ :

দুর্ভাগ্যক্রমে কতিপয় লোক আজকাল ইসলামের নামে অনেক ধরণের সন্ত্রাসমূলক কাজ করে থাকে। সংখ্যায় তারা সামান্য ক'জনই, যারা তাদের নিজ ধর্মের সাথে প্রতারণা করে। ইসলামের নামে যারা অন্যলোকদের বিরুদ্ধে এসব নৃশংসতা ঘটায় এবং সন্ত্রাসী কর্ম করে, তাদেরকে কখনোই ইসলামের সুন্দর নামটি ছিনিয়ে নিতে দেয়া অথবা ইসলামের দূত এবং প্রতিনিধি হতে দেয়া যায় না। তারা হচ্ছে তাদের নিজ-ধর্মের অমান্যকারী এবং সেজন্যে তারা কঠোরভাবে নিন্দার যোগ্য, এবং আগ্রাসী-কর্ম ও ইসলামের সুন্দর নামকে কলঙ্কিত করার জন্যে কঠোর শাস্তি পাবার যোগ্য।

আহমদীয়া জামাতের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় ইসলামের দর্শন বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : *'ইসলামের সংশ্লিষ্টতা যতদূর রয়েছে, সন্ত্রাসবাদের প্রত্যেক প্রণালীকে এটা প্রত্যাখ্যান ও নিন্দা করে। হিংস্রতার যে-কোন কাজকে এটা কোন- রূপ আচ্ছাদন দেয় না, তা সেটা কোন ব্যক্তি, দল, অথবা সরকার কর্তৃকই করা হোক না কেন। সন্ত্রাসবাদের সব কর্ম এবং ধরনেরই আমি কঠোরভাবে নিন্দা করি, কারণ এটা আমার বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, কেবল ইসলামই নয়, কোন সত্য ধর্মই, তা সেটা যে নামেই হোক, ধর্মের নামে নিরীহ্ মানুষ, নারী ও শিশুদের প্রতি সন্ত্রাস ও তাদের রক্তপাতের অনুমোদন দিতে পারে না'* (ধর্মের নামে রক্তপাত, পৃ: ১১৬, ১১৯)।

ইসলামের শিক্ষাগুলোর পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে অল্প ক'টি উদাহরণ আমি এখানে উপস্থাপন করেছি সেগুলো থেকে এটা পরিস্কার ভাবে প্রমাণ করে যে, সন্ত্রাসবাদ অথবা অন্যলোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিস্তার করার শিক্ষা ইসলাম কোথাও উল্লেখ করেনি। এটা একথাও প্রমাণ করে যে, কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ এক লোকই একজন খাঁটি মুসলমান হতে পারে এবং যেসব লোক নৃশংসতা, আগ্রাসন এবং ইসলামের নামে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণের মত অন্যান্য বর্বরতাপূর্ণ কাজ করে, তারা মুসলমান নামে আখ্যায়িত হবার উপযুক্ত হতে পারে না।

একথা বলা যে, একজন মুসলমান হচ্ছে একজন সন্ত্রাসবাদী, অথবা কুধারনাপ্রসূত 'মুসলমান-সন্ত্রাসবাদী'–কথাটি ব্যবহার করা অবশ্যই আলো ও অন্ধকার, আগুন ও পানি, অথবা মৃত্যু ও জীবনকে একত্র করে দেখার মত একটি ব্যাপার, অথচ ওগুলো একটি থেকে অপরটি সম্পূর্ণরূপে আলাদা। আমি আপনাদেরকে এটা নিশ্চিত করছি যে, একজন খাঁটি মুসলমান কখনোই একজন সন্ত্রাসী হতে পারে না, এবং একজন সন্ত্রাসবাদী কখনোই একজন খাঁটি মুসলমান বলে আখ্যায়িত হতে পারে না! ইসলামে সন্ত্রাসবাদের কোনই স্থান নেই। এবং সন্ত্রাসবাদের পুরো ধারণাটিই সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যহীন।

আহমদীয়া ইসলামের পরিচিতি :

আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্যই এটা ভেবে আশ্চর্য হবেন যে, আজকের বিশ্বে প্রকৃতপক্ষে কেউ কি এ ধরনের ইসলামে বিশ্বাস এবং অনুশীলন করে?

এ ধরণের একটি মুসলমান জামাত আজো রয়েছে। এর নাম হচ্ছে 'আহমদীয়া মুসলিম জামাত'। এটা হচ্ছে ইসলামের আসল বার্তা, যা ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর নাযেলকৃত সর্বশক্তিমান খোদার মুখনিসৃত বাণী, যেভাবে পবিত্র কুরআনে ধারণকৃত রয়েছে, উহার পুনরুজ্জীবনের কাজে উৎসর্গীকৃত ঐশী অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী এক জামাত।

সর্বশক্তিমান খোদা, আখেরী জামানায় ইমাম মাহ্‌দী, সঠিক হেদায়াত প্রাপ্ত নেতা ও প্রতিশ্রুত মসীহ্‌রূপে ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার এক আধ্যাত্মিক পুত্রকে সমগ্র মানবজাতির উদ্ধারকল্পে ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্যে প্রেরণ করা নির্ধারিত করেছিলেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.), যিনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে এসব উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। ঐশী নির্দেশ ও নেতৃত্বে তিনি ১৮৮৯ সনের ২৩শে মার্চ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভিত্তি স্থাপন করেন।

এই জামাত হচ্ছে ইসলামের আদি বিশুদ্ধ সদাশয় বাণীর সমষ্টি, যা বিশ্বজনীন শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি করে। এটা হচ্ছে এমন একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় সম্প্রদায়, যেটার কোনই রাজনৈতিক-উদ্দেশ্য নেই; বিশ্বের সব অংশের মানবজাতির উন্নয়ন ও সেবার জন্যে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর যে আদর্শ বাণী–"ভালবাসা সবার তরে, ঘৃনা নয় কারো পরে'–তা ইসলামের নির্যাসকে সুন্দরভাবে সংরক্ষিত করে। এ জামাত এমন শত শত স্কুল ও কলেজ নির্মাণ, চিকিৎসাগার ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত, যেগুলো সবার জন্যেই উন্মুক্ত এবং উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রী ও রোগীদেরকে সাহায্য করে চলছে। জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত এর দাতব্য প্রতিষ্ঠান 'হিউম্যানিটি ফার্স্ট' সর্বদাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সব মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় জনহিতকর সাহায্য প্রদানে অগ্রগামী রয়েছে।

এই জামাত নিরলসভাবে সমগ্র বিশ্বে প্রকৃত-ইসলামের জীবন-সঞ্চারী শান্তিপূর্ণ বাণী প্রচার ও তাতে অংশগ্রহণে নিযুক্ত রয়েছে। ৬৯ এর অধিক ভাষায় এ জামাত পবিত্র কুরআনের অনুবাদ এবং বিশ্বের ১২০টি ভাষায় এর অন্যান্য ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ করেছে। এ-জামাত দিবারাত্র ২৪ ঘন্টা এম, টি, এ, খ্যাত ওয়ার্ল্ড ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক 'মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল'–চালাচ্ছে, যেটা বিশ্বের কয়েকটি ভাষায় পৃথিবীর কোনায় কোনায় এর বার্তা পৌঁছাচ্ছে। প্রত্যেক মাসে ১০ লক্ষেরও অধিক মানুষ 'আল ইসলাম ডট অরগ' নামের শক্তিশালী ওয়েবসাইট দেখছে।

প্রায় ১২১ বছর আগে (বর্তমান ১২৩ বছর–অনুবাদক) এর শুভ-সূচনা থেকে এখন পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামাত আধুনিক ইতিহাসে 'ইসলামের অতি প্রগতিশীল জামাত' হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। ১৯৫টির অধিক দেশে (বর্তমানে ২০২টি দেশে–অনুবাদক) এর সক্রিয়-শাখাসমূহ রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৯০ সনে পোল্যান্ডে এ জামাতটি পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়।

খিলাফত ব্যবস্থা হচ্ছে এ জামাতটি 'বিশেষ পার্থক্যকারী এক বৈশিষ্ট' : এটা হচ্ছে নেতৃত্বের এক আধ্যাত্মিক-পদ্ধতি, যেটা ঐশীভাবে প্রতিষ্ঠিত, অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত। এ-পদ্ধতিতে যিনি নেতা হন, তিনি 'খলীফা'-নামে পরিচিত, যিনি হচ্ছেন নিখিল বিশ্ব জামাতের আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও প্রশাসনিক নেতা। জামাতের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) হচ্ছেন জামাত প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর ৫ম উত্তরাধিকারী। খিলাফতের এই পদ্ধতিটি, যেটার গোড়া হচ্ছে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, এবং যেটা হচ্ছে ইসলামের পবিত্র নবী (সা.) এর মতে জামাতের সব উন্নতির পেছনের প্রকৃত প্রেরণাদায়ী ও ঐক্যসাধনকারী শক্তি। অন্য কোন মুসলমান সম্প্রদায় এইরূপ সম্মানের সৌভাগ্য লাভ করতে পারছে না।

উপসংহার :

ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষাগুলো এবং এ জামাতের মধ্যে আপনারা যেসব শান্তিদানকারী শিক্ষার বাস্তব-প্রকাশ দেখতে পান, এতক্ষণ আমি সেগুলোর ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছি। মানবজাতিকে দেয়া হেদায়াতের চূড়ান্ত-বাণী এবং মুক্তির সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপত্র হলো 'ইসলাম', যেটা হচ্ছে–ভালবাসা ও শান্তির একটি বার্তা, এবং সেটা কখনোই সন্ত্রাস অথবা যুদ্ধের কোন বার্তা নয়।

একদল সন্ত্রাসী ও চরমপন্থী যে-নৃশংসতা ও ভয়াবহতা সংঘটিত করে চলেছে, সেটার অভিজ্ঞতা আপনাদের মনে যে ভীতির উদ্রেক করেছে, সেটাকে একপাশে রাখুন। কোন ভাবেই তারা ইসলামের কোন প্রতিনিধি নয়, তারা ইসলামের মানদণ্ড বহনকারী কেউ নয়। তাদেরকে ইসলামের বোদ্ধার মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করার চাইতে অতিরিক্ত অন্যায় কাজ আর কিছু নেই। বিশ্বাসঘাতক এবং খেলাপকারীরা কখনোই তাদের ধর্মের রাজদূত হতে পারে না।

নিশ্চিত থাকুন, সেটাই হচ্ছে খাঁটি ইসলাম, খোদার পরম-বাক্য পবিত্র কুরআনের আইনসঙ্গত কর্তৃত্বের সীলমোহর যেটা বহন করে এবং যা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা পবিত্র নবী (সা.) এর কথা ও মহৎ-অনুশীলনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ ইসলাম 'শান্তি বই আর কিছুই নয়'।

আসল এবং শান্তিপূর্ণ-ইসলামের ব্যাপারে সমগ্র পোল্যান্ডবাসীদের ভীত হবার প্রয়োজন নেই। এটা আপনাদের বৃহৎ দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি কোন হুমকি নয়। ইসলামের লুক্কায়িত এসব শত্রুদের চরম-পন্থার বিপথগামীতা ও ভীতিপ্রদ-কার্যকলাপে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। ইসলাম হচ্ছে সবার জন্যে আশাপ্রদ জীবন প্রদায়ী এক ধর্ম।

আমার প্রিয় পোল্যান্ডবাসী বন্ধুগণ! এগিয়ে আসুন এবং ইসলামের ভিত্তি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করুন। এর মধ্যে আপনারা কেবলই ভালবাসা, শান্তি, ঐক্য এবং চিরস্থায়ী-মুক্তি দেখতে পাবেন। খোদা আপনাদের সবাইকে এবং আপনাদের দেশকেও প্রচুর সুখ-সমৃদ্ধি দান করুন।

ইমাম হুসাইন (রা.) এবং কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা

মূল : *হাফেজ মোজাফ্‌ফর আহমদ সাহেব, রাবওয়া*
অনুবাদ : *মোহাম্মদ ফজলুর রহমান*

হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) হচ্ছেন পবিত্র নবী (সা.) এর মহিমান্বিত দৌহিত্র। হিজরী ৪র্থ বছরে [নবী (সা.) এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ৪ বছর পরে) তিনি পবিত্র নবী (সা.) এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযি.) এর গর্ভে এবং তাঁর স্বামী হযরত আলী (রা.) ঔরষে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুটির নাম রাখা হয় হুসাইন (রা.)। আরবী ভাষায় 'হাসান'-শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সৌন্দর্য', সেমতে 'হুসাইন'-এর অর্থ হচ্ছে– 'সৌন্দর্যের একটি অংশ'। নবী (সা.) নিজে তার কানে আযান (নামাযের আহ্বান) পাঠ করে শোনান, কারণ তিনি হচ্ছেন মুসলমানদের নবজাত শিশুদের প্রতীক, এবং আক্বিকা অনুষ্ঠানও তিনিই সম্পন্ন করেন (আল নিসাই)।

পবিত্র নবী (সা.) এর বংশধরদের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক কোন পুরুষ-ই জীবিত ছিলেন না বিধায় স্বভাবতই তিনি (সা.) তাঁর দৌহিত্র হুসাইন (রা.) ও তাঁর ভাই হাসান (রা.) কে ভালবাসতেন।

পবিত্র নবী (সা.) এর এক সেবক হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, পরিবারের সবার মধ্য থেকে হাসান (রা.) ও হুসাইন (রা.) তাঁর ভালবাসা সবচাইতে বেশী পেয়েছেন। পবিত্র নবী (সা.) তাদেরকে দেখতে প্রায়ই তাদের বাড়ী যেতেন। তিনি (সা.) তাদের খেলাধূলা উপভোগ করতেন এবং স্নেহভরে তাদেরকে তাঁর বুকের উপর উঠাতেন এবং ধারণ করতেন। মাঝে মাঝে এমনও হতো যে, নামায আদায়ের সময় পবিত্র নবী (সা.) যখন সেজদায় যেতেন, তাঁর নাতিরা তাঁর পিঠের উপর উঠে বসতেন, আর নবী (সা.) এক দীর্ঘ সময় ধরে সেজদায় পড়ে থাকতেন। নামায শেষ হলে নবী (সা.) তাদেরকে কোলে তুলে নিতেন।

পবিত্র নবী (সা.) একবার মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করছিলেন। হুসাইন (রা.) যখন মসজিদে ঢুকলেন, পবিত্র নবী (সা.) এর দুষ্টি তার উপর নিপতিত হলো। তিনি (সা.) মিম্বর থেকে নামলেন, যেখান থেকে খুতবা দিচ্ছিলেন। হুসাইন (রা.)কে উঠিয়ে নিলেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পবিত্র নবী (সা.) তাঁর নাতিদের জন্যে বিশেষ ভাবে এ দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ্, আমি তাদের উভয়কে ভালবাসি, তুমিও তাদেরকে একইভাবে ভাল বেসো" (বুখারী, কিতাবুল ফাযায়েল)।

পবিত্র নবী (সা.) বলতেন, "যারা তাদেরকে (হাসান হুসাইনকে) ভালবাসে, তারা আমাকে ভালবাসে, এবং যারা তাদের বিরুদ্ধে ঈর্ষা পোষণ করে, তারা আমার বিরুদ্ধেই ঈর্ষা পোষণ করে। হুসাইন হচ্ছে আমার, আর আমি হচ্ছি হুসাইন-এর। যারা হুসাইনকে ভালবাসে, তারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাবে" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)।

হযরত হুসাইন (রা.) সাত বছরকাল পবিত্র নবী (সা.) কর্তৃক শিক্ষালাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। পবিত্র নবী (সা.) এর পর প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফা যথাক্রমে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) হুসাইন (রা.)কে শ্রদ্ধা ও তাজিম-এর সাথে দেখাশুনা করতেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.) এর যুগে হযরত হুসাইন (রা.) তাবিরিস্তান (বা তাপুরিয়া) এর জিহাদে অংশগ্রহণ করার সম্মান লাভ করেন (ইবন কাছির, ৩য় খন্ড-পৃ:৪৫)।

হযরত উসমান (রা.) এর অবরোধ কালে হযরত হুসাইন (রা.) ও হযরত হাসান (রা.) হযরত আলী (রা.) কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে হযরত উসমান (রা.) কে রক্ষায় পাহারারত থাকেন এবং তাতে উশৃংখল জনতা কোনঠাসা হয়ে পড়ে (তারিখুল খুলাফা, জালালুদ্দিন সিউতি)।

হযরত আলী (রা.) এর শাহাদাতের পর হুসাইন (রা.) তার ভাই হযরত হাসান (রা.) এর সাথে বশ্যতার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন এবং আমীর মুআবিয়ার সাথে সমন্বয়ের কাজে জড়িত হন। তার (রা.) জ্ঞান ছিল লক্ষণীয় এবং বাগ্মিতা ছিল অপ্রতীদ্বন্দ্বী। তাঁর রাতগুলো কাটতো প্রার্থনারত অবস্থায় , এবং তিনি প্রচুর-পরিমাণে দান-খয়রাত করতেন। পবিত্র নবী (সা.) একবার বর্ণনা করেন যে, "হাসান ও হুসাইন-উভয়েই হচ্ছে আমার কাছে বিশ্বের সর্বোত্তম সুগন্ধি" (বুখারী, ফাযায়েলে সাহাবা)।

হযরত আনাস (রা.) এর মতে হাসান (রা.) ও হুসাইন (রা.) পবিত্র নবী (সা.) এর সাথে সর্বোচ্চ-সাদৃশ্য ধারন করতেন। (বুখারী কিতাবুল ফাযায়েল)।

পবিত্র নবী (সা.) বর্ণনা করেন যে, "হাসান (রা.) এবং হুসাইন (রা.) হচ্ছে বেহেশ্‌তে তরুনদের নেতা"। তিনি (সা.) বলেন, "যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়, তারা আমার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে, এবং যারা তাদের সাথে সমন্বয় সাধন করে, তারা

আমার সাথেই সমন্বয় করে।

ইসলামের ইতিহাসে হযরত হুসাইন (রা.) এর শাহাদত ছিল সবচে' বিষাদময় ঘটনাগুলোর অন্যতম। কোন মুসলমানই চরম ব্যথাহত ও দুঃখিত না হয়ে প্রকাশিত এসব ঘটনার বর্ণনা পাঠ করতে পারে না।

এজিদ ও হুসাইন (রা.), এই দুই প্রধান-ব্যক্তির উভয়েই নিজকে মুসলমান বলে দাবী করে, এবং উভয়েই প্রকাশ্যে মুসলিম ধর্মমত প্রচার করে। তা সত্বেও তাদের একজন এজিদ, যে সত্যিকারে ইসলামের অর্থ বুঝেনি। সততাও ন্যায়-বিচার সম্পর্কে ইসলামের বিশ্বাস ও আদেশকে সে উপেক্ষা করেছিল এবং সে-কারণে সে অত্যাচারী হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে হযরত হযরত হুসাইন (রা.) খাঁটি ইসলামী তেজ, সাহসীকতা, সহিষ্ণুতা ও সংকল্প প্রদর্শনে নিজেকে বিজড়িত করে এবং অত্যাচারিত হয় (২০১০ সনের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত জুমুআর খুতবা)।

কারবালার ঘটনা

হিজরী ৫৬ সনে আমীর মাবিয়া [হযরত আলী (রা.)-র পর নিজকে খলীফা বলে দাবীকারী] তার পুত্র এজিদকে 'খিলাফতের আপাত-উত্তরাধিকারী' নিযুক্ত করে। বিভাজন রোধ করতে মুসলমানদের এক বৃহৎ-সংখ্যা এজিদের হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। যাহোক, হুসাইন (রা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.), আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইর (রা.) এবং অন্য কিছু-সংখ্যক লোক এটা অনুভব করলেন যে, এজিদের অধার্মিকতা ও অযোগ্যতার কারণে সে খিলাফতের হকদার নয় এবং খিলাফতের উত্তরাধিকারী হবার উপযুক্ত নয়। এর জবাবে আমীর মাবিয়া জানিয়ে দিল যে, আপাত-উত্তরাধিকারী হিসেবে এজিদকে নিযুক্ত করার পর তাকে অমান্য করা অথবা তার সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করার কোন অধিকার কারো নেই।

৬০ হিজরী সনে আমীর মাবিয়ার মৃত্যুর পর মদীনার আমীরকে এজিদ এই তিনজন, অর্থাৎ-হুসাইন (রা.), আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) এবং আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.)-এর আনুগত্যের শপথ গ্রহণের তাৎক্ষণিক নির্দেশ দেয়, যার ভিত্তিতে হুসাইন (রা.) এবং আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) মক্কায়

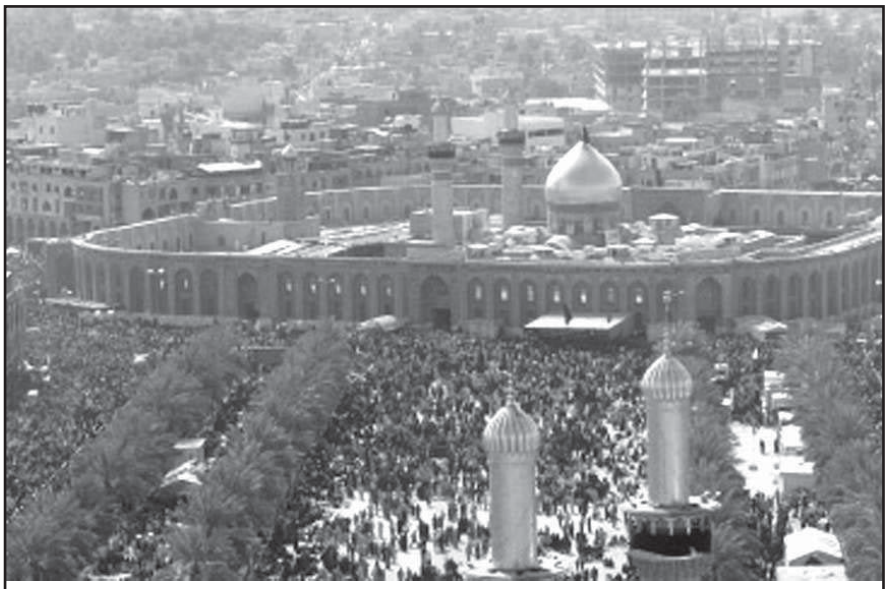

ইরাকের কারবালা শহরে অবস্থিত শিয়া সম্প্রদায়ের পবিত্র স্থান–হুসাইন (রা.) এর মাজার

যান। হুসাইন (রা.) এর আনুগত্যের শপথ গ্রহণের আকাঙ্খা ব্যক্ত করে ইরাক থেকে বহু সংখ্যক পত্র প্রেরণ করা হয়। আনুগত্যের শপথ গ্রহণে বাহ্যত: প্রস্তুত এমন প্রায় ১৮০০০ লোককে খুঁজে বের করার জন্যে তিনি মুসলিম বিন আকীলকে কুফায় প্রেরণ করেন। তিনি কুফায় যাবার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস এবং অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠগণ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। হুসাইন (রা.) তাদেরকে ইস্তেখারা নামায আদায় করতে বলে একথা বললেন, "ঐশী নির্দেশ মোতাবেক আপনারা আপনাদের মনস্থির করুন"। এভাবে তারা কুফায় যাবার জন্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

ইতোমধ্যে এজিদ দেখলো যে, কুফার লোকেরা মুসলিম বিন আকিলের মাধ্যমে ইমাম হুসাইন-এর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে ফেলেছে। এজিদ বসরার আমীর ইবনে জিয়াদ-কে কুফায় প্রেরণ করলো এবং অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছলো, যখন মুসলিম বিন আকীলকে শহীদ করা হলো।

হুসাইন (রা.) কূফার বিপজ্জনক পরিস্থিতি অবহিত ছিলেন এবং এ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সব কিছুই খোদার হাতে। তিনি (রা.) মনে করলেন যে, খোদা যা চান, তাই হবে। বস্তুত: প্রতিনিয়তই তিনি (খোদা) নিজেকে এক নূতন দীপ্তিতে প্রকাশ করে থাকেন। তিনি (রা.) ভাবলেন, "ঐশী ইচ্ছা যদি আমাদের লক্ষ্য বস্তুর পক্ষে থাকে, তবে এজন্যে আমরা খোদার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু ঐশী ইচ্ছা যদি আমাদের লক্ষ্যবস্তু অর্জনে বাধা দেয়, তবে তা এমন ব্যক্তির জন্যে ভ্রমাত্মক কিছু নয়, যে খোদাকে ভয় করে এবং যার ইচ্ছা আন্তরিক"।

হুসাইন (রা.) মুসলিম বিন আকীল-এর নিহত হবার কারণ খুঁজে পেলেন। আকিল (রা.) এর ভাই প্রতিশোধ দাবী করার জন্যে কুফায় গিয়েছিলেন। এ সময়ের মধ্যে হুসাইন (রা.) স্বপ্নে পবিত্র নবী (সা.) কে দেখলেন, যিনি তাকে কতিপয় নির্দেশ দান করলেন। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা তিনি (রা.) এ অর্থে করলেন যে, এখন তার প্রতি যা-ই ঘটবে, তা থেকে পিছু হটার কোন উপায় নেই।

তার দলের প্রত্যেককে তিনি ফেরত যাবার অধিকার দান করলেন। আম জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো এবং কেবল আহলে বায়েত [পবিত্র নবী (সা.) এর পরিবার] এবং কতিপয় সাহাবা রয়ে গেলেন, যাদের মধ্যে সর্বমোট প্রায় ৭২ জন হুসাইন (রা.) এর তাবুতে রয়ে গেলেন। ইত্যবসরে এজিদ ১০০০ সৈন্যের একটি দল নিয়ে সেখানে হাজির হলো এবং হুসাইন (রা.) এর দলকে আটক করে কুফায় নিয়ে যেতে মনস্থ করলো।

হুসাইন (রা.) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, "কুফার মানুষের আগ্রহে আমি কূফা

যাচ্ছিলাম, তারা যদি তাদের মত পরিবর্তন করে থাকে, তবে আমি ফিরে যাবো”।

কুফা থেকে প্রাপ্ত পত্র তিনি হার্বান কায়েসকে দেখালেন। হার্বান জবান দিলেন– “এ পত্র আমরা লিখিনি এবং তোমাকে কুফায় প্রেরণের জন্যে আমীরের তরফ থেকে আমাদের কাছে নির্দেশ রয়েছে”।

হুসাইন (রা.) জবাব দিলেন, “এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়”।

ফিরে যাবার অধিকার আর অবশিষ্ট রইলো না। ঐশী ইচ্ছাই নির্ধারিত হলো। ইমাম হুসাইন (রা.) সহসা ঘুম থেকে জাগলেন। তিনি বলে উঠলেন, ‘ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (নিশ্চয়ই আমাদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্, আর আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবো) এবং তারপর ‘আলহামদু লিল্লাহ্’ (সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র) এবং বললেন, ‘স্বপ্নে এক আগন্তুক আমার কাছে বর্ণনা করলেন যে, “জাতি এর মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে”।

তাঁর পুত্র জয়নুল আবেদীন (রা.) বললেন, “সত্যের পথে মৃত্যু হলে তাতে কি-ই বা এসে যায়”?

মহররম মাসের তৃতীয় দিনে ইবনে সা’দ ৪০০০ সৈন্যের একটি দল নিয়ে হাজির হলো। সে ইবনে জিয়াদের একটি নির্দেশ পাঠ করে শোনালো, যাতে লিখা ছিল, “হুসাইন-এর উচিত কুফায় আসা এবং এজিদের কাছে আনুগত্যের শপথ করা” (ইবনে কাছির)।

৭ই মহররম তারা হুসাইন (রা.) এবং তার পরিবারের পানির উৎস বন্ধ করে দিল। এ কারণে তাঁর পরিবার চরম কষ্টে নিপতিত হলো। বস্তুত: এজিদের তাঁবু থেকে আগত একজন লোক এই নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে না পেরে স্বপক্ষ ত্যাগ করে ইমাম হুসাইন (রা.) এর দলে ঠাঁই নিল।

১০ই মহররম ছিল ইমাম হুসাইন (রা.) এর শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধিবর্গের জন্যে শেষ রাত্রি। হুসাইন (রা.) এবং তাঁর লোকেরা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হলেন। তাদের অস্ত্রগুলোকে তারা ধার দিয়ে নিলেন এবং গভীর প্রার্থনায় রাত কাটিয়ে দিলেন। এটা দেখে তাঁর বোন জয়নব হুসাইন (রা.)কে বললেন, “কেবল মৃত্যুই যদি আজ আমাকে শেষ করে দিত! আমার মা ফতেমা বাবা আলী এবং ভাই হাসান (মরহুম) এরপর তুমি একাই আমাদের সমর্থনে ছিলে”। হুসাইন (রা.) জবাব দিলেন, “জয়নব, তোমার সম্মানকে তুমি শয়তানের উপর সোপর্দ করো না”। তিনি (জয়নব) বললেন, “ভাই, আমি আমার জীবন তোমার জন্যে উৎসর্গ করতে পারি”।

হুসাইন (রা.) এর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করলো। জয়নব (রা.) ও কাঁদতে শুরু করলেন। হুসাইন তাকে (জয়নবকে) ধৈর্যধারণ করতে উপদেশ দিয়ে বললেন, “আমাদের সবাইকে একদিন আমাদের খোদার কাছে ফিরে যেতে হবে। খোদার নামে এ প্রতিজ্ঞা করো যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা পবিত্র নবী (সা.) এর আদর্শের বিপরীত কোন কাজ করবে না। অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলে কাউকে অপদস্থ করবে না” (তারিখ ইবনে কাছির, পৃ: ৫১৪)।

সবশেষে আশুরার (১০ই মহররম তারিখে) সকাল বেলায় বিচার-দিবস উপস্থিত হলো। ৪০০০ হাজার সৈন্যের বিপরীতে হুসাইন (রা.) এর সাথে মাত্র ৭২ জন লোক ছিল। হুসাইন (রা.) এর তাঁবুর পতাকাটি ছিল আব্বাস (রা.) এর হাতে।

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে হুসাইন (রা.) নিজের সামনে পবিত্র কুরআন রাখলেন, দুই হাত উর্ধে তুলে দোয়া করলেন, “প্রভু, তুমি হচ্ছ একক-সত্বা, প্রত্যেক কষ্টের সময় আমি তোমার উপর নির্ভর করি, আর তুমিই হচ্ছ প্রত্যেক কষ্ট থেকে মুক্তিদাতা। সর্বদাই তুমিই ছিলে আমার রক্ষক, এবং সর্বদা আমি একমাত্র তোমারই কাছে নিজেকে সোপর্দ করেছি। তুমি একাই হচ্ছ সব মঙ্গলের মালিক।

শত্রুদের কাছে তিনি আরেকবার শান্তিপূর্ণ স্থানে যাবার নিরাপদ-রাস্তা দাবী করলেন। যা হোক, তারা এর প্রথম শর্ত হিসেবে এজিদের কাছে আনুগত্যের শপথ করার জেদ ধরলো।

এই বিপদাপন্ন পরিবেশে হুসাইন (রা.) জোহর (দুপুর) এর নামায আদায় করলেন। তুমুল যুদ্ধ তখন ছিল আসন্ন। প্রখ্যাত যোদ্ধা হানাফি (রা.) হুসাইন (রা.) এর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁকে রক্ষা করতে তার জীবন দান করলেন। এরপর জহির বিন কায়েস (রা.)কে শহীদ করা হলো। তাঁকে রক্ষার প্রচেষ্টায় বেপরোয়াভাবে একের পর এক তার অন্যান্য সঙ্গীরাও এগিয়ে এসে যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। শহীদ হবার পূর্বে তারা ক্রোধে চীৎকার করে বলেছিল, “আমরা তোমাকে সাহায্য করতে পারলাম না”।

একথার জবাবে ইমাম হুসাইন (রা.) বললেন, “ন্যায়পরায়নদের জন্যে নির্ধারিত পুরস্কার আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করুন”।

এসব বিশ্বস্ত লোকদের শাহাদতের পর পালা আসে ‘আহ্‌লে বয়াত [পবিত্র নবী (সা.) এর পরিবার) এর। যুবক আলী আকবর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে বললেন, “আমি হলাম হুসাইন (রা.) বিন হযরত আলীর পুত্র। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করছি, আমি পবিত্র নবী (সা.) এর সাহাবী”। যুদ্ধের ময়দানে অসীম সাহসের সাথে লড়াই করে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেন। তার ফুফু জয়নব (রা.) নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। তখন হুসাইন (রা.) তাকে তাঁবুতে ফেরত পাঠালেন। আলী (রা.) এর দেহ তাঁবুগুলোর একটির কাছেই ছিল।

পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ্ (রা.), যিনি মুসলিম বিন আকিল (রা.) এর পুত্র এবং জাফর তায়ার (রা.) এর পৌত্র, আদ্দি (রা.), যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং নিহত হলেন। এরপর আব্দুর রহমান (রা.), পিতা আকিল (রা.) এবং কাশেম (রা.), পিতা-হাসান (রা.) শহীদ হলেন। এটা দেখে আব্বাস (রা.) ইশারায় আব্দুল্লাহ্ (রা.), জাফর (রা.) এবং উসমান (রা.) এই তিন ভাই হুসাইন (রা.) এর সামনে রক্ষণ-বুহ্য তৈরী করলেন। তারাও নিহত হলেন। আব্বাস (রা.)ই রয়ে গেলেন ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শেষ ব্যক্তি। তিনিও নিহত হলেন, আর এভাবে শহীদের দরজা লাভ করলেন।

পবিত্র নবী (সা.) এর পরিবারের ২০ জন সদস্য কারবালার ময়দানে নিহত হলেন।

এবার হুসাইন (রা.) একাকী রয়ে গেলেন। তৃষ্ণা নিবারনের জন্যে যখন তিনি নদীতে গেলেন, তখন তাঁর দিকে একটা তীর নিক্ষেপ করা হলো, যা তার মুখমন্ডলে আঘাত করলো, আর তাতে ফিন্‌কি দিয়ে ঝরনার মত রক্ত প্রবাহিত হলো। তথাপি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করলেন। শত্রুদের উদ্দেশ্যে তিনি বলে গেলেন : “আমি খোদার নামে শপথ করে বলছি, আজকের পর তোমরা যাকেই হত্যা কর না কেন, তাতে আজকের চাইতে

অধিক হারে খোদার ক্রোধকে জাগাবে না"।

কুফার লোকেরা এরপর মুসলমানদের তাঁবু লুট করা শুরু করলো, এমন কি, তারা মহিলাদের শিরস্ত্রানগুলো পর্যন্ত খুলে নিতে শুরু করলো।

উমর বিন সা'দ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে অশ্বারোহীরা তাদের অশ্ব চালনা শুরু করে হুসাইন (রা.) এর মৃত দেহকে পদদলিত করলো।

এরপর উমর বিন সা'দ চিৎকার করে বলে উঠলো, "অশ্বারোহীদের মধ্যে কে আছে যে, হুসাইন (রা.) মৃত দেহের উপর দিয়ে অশ্ব চালনা করবে"?

১০জন অশ্বারোহী তার এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে হুসাইন (রা.) এর দেহের উপর দিয়ে এমন ভাবে অশ্ব চালনা করলো, যাতে তাঁর বুক ও পিঠ সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয়ে গেল।

৪৫টি তীর, ৩৩টি বল্লম, এবং ৪০টিরও অধিক তরবারি দ্বারা ইমাম হুসাইন (রা.) এর শরীরে আঘাত করা হয় অত্যধিক নিষ্ঠুর আচরন করে হুসাইন (রা.)-এর মাথা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কুফায় প্রেরণ করা হয়, যেখানে গবর্ণর এটাকে জনসমক্ষে প্রদর্শন করে।

সংক্ষেপে এটাই হলো ইসলামের ইতিহাসে এক বিষাদময় দিন, যখন এই নির্দয় ব্যাপক হত্যায় খোদার মহান লোকদের রক্তপাত ঘটানো হয়। যাহোক, সত্যকে সমুন্নত রাখার জন্যে ইমাম হুসাইন (রা.) যে তাঁর জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইমাম হুসাইন (রা.) এর এই বর্বোরোচিত হত্যার পর এক অধিক-সংখ্যক লোক তাঁর প্রশংসায় পত্র লিখেন, যেভাবে তাঁর কন্যা সাকিনা লিখেছিলেন :

"হে চোখ, আজীবন তুমি তোমার বাচ্চাদের মায়ের এবং বন্ধুদের কারণে অশ্রুপাত করবে না, কিন্তু রসূলের দৌহিত্রের রক্তপাতের জন্যে সেটাতো করেই চলবে।

এজিদের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইন (রা.) এর প্রতিরোধ

হযরত হুসাইন (রা.)-এর এজিদকে প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টিকে দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যালঘু একদল মুসলমান বিদ্রোহ হিসেবে বিবেচনা করে, অথচ এটা হলো বাস্তবতার বিপরীত। এজিদের বিরুদ্ধে হযরত ইমাম হুসাইন-এর দন্ডায়মান হবার কারণ এটা ছিল না যে, এজিদ এ দাবী করেছিল যে, সে যথার্থই একজন নির্দেশিত খলীফা। খিলাফতে রাশেদা [পবিত্র নবী (সা.) এর অনুসরণে সঠিকভাবে পরিচালিত খিলাফত] পবিত্র নবী (সা.) এর ওফাতের ৩০ বছর পরই শেষ হয়ে যায়, যেভাবে নবী (সা.) নিজে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ইমাম হুসাইন (রা.) এর বিরোধীতা ছিল অত্যাচারী-সার্বভৌমত্বকে, এক স্বনিয়ন্ত্রিত খলিফাকে প্রতিহত করার মাধ্যমে অত্যাচারীতদেরকে রক্ষা ও সাহায্য করা।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাঁর লেখায় বর্ণনা করেন যে, এজিদ ছিল জমিনের এক অপবিত্র কীট, দুনিয়ার ভালবাসায় অন্ধ। অপরপক্ষে, হুসাইন (রা.) ছিলেন সত্যবাদী এবং যিনি অনাগত মুসলমানদের অনুসরণের জন্যে এক খাঁটি নমূনা দান করে গিয়েছেন। তিনি (আ.) লিখেন যে, হযরত হুসাইন (রা.) এর অপযশ করা চরম অন্যায়, এবং যে এরূপ করে, সে তার ইমান নষ্ট করে।

প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর ঘরে একবার হযরত হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল। ঘটনা শুনে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদতে শুরু করলেন এবং গভীর যন্ত্রণার সাথে বর্ণনা করলেন : "পবিত্র নবী (সা.) এর দৌহিত্রের সাথে এজিদ এই নিষ্ঠুর আচরণ করেছে, কিন্তু খোদাও এই অত্যাচারীর উপর দ্রুত তার ক্রোধ-বর্ষণ করেছেন" (সীরাতে তাইয়্যেবা, হযরত মির্যা বশির আহমদ (রা.), পৃঃ ৩৬)।

কারবালা স্মরণে

এই শাহাদাতের ঘটনা শেষ নাগাদ শিয়া-সুন্নীর বিভক্তিতে পর্যবসিত হয় ; শিয়াগণের ধারণা হচ্ছে, মুসলমান অনুসারীদের ইমামতের (নেতৃত্বের) মালীক ছিলেন হযরত আলী (রা.), অপরপক্ষে সুন্নীরা পবিত্র নবী (সা.) এর হাদীসের অনুসারী হয়। পরবর্তীতে প্রত্যেক দলের মধ্যে অনেক পার্থক্যের উদ্ভব হয়। প্রতি বছর মহররম মাসের প্রথম দশ দিন সারা বিশ্বে কতিপয় মুসলমান হযরত ইমাম হুসাইন (রা.), তার পরিবার এবং সাথীদের শাহাদাত উদযাপন করে, এবং ঐ ভয়াবহ ঘটনা, যেটা ১০০০ বছরের অধিককাল পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল, তার জন্যে শোক প্রকাশ করে। কিছু লোক রাস্তায় বের হয়ে অত্যধিক বিলাপ করে, হাত ও অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা তাদের বক্ষে প্রহার করে। অন্যান্যরা শোভাযাত্রা, বিশেষভাবে সংগঠিত অনুষ্ঠান ও অন্যান্য কার্যক্রমে মসজিদ ও হলসমূহের জমায়েতের অংশ নেয়।

যেভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) প্রদত্ত ১০ই ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখের জুমুআর খুতবায় ব্যাখ্যা দান করেছেন, তা হচ্ছে, কারবালাকে স্মরণ করার উত্তম পন্থা হচ্ছে দরূদ প্রেরণ করা [পবিত্র নবী (সা.) এবং তাঁর পরিবারের ছালাম ও আশীর্বাদ প্রদান করা] এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে পবিত্র সংশোধন আনয়ন করা।

তিনি (আই.) বলেন যে, কারবালার ঘটনায় সব মুসলমানই দুঃখ ও বেদনা অনুভব করে। কতিপয় মুসলমান- সম্প্রদায় যখন এমন প্রথা অবলম্বন করে, যা আমাদের ধারণায় সম্পূর্ণ চরমপন্থা বলে প্রতীয়মান হয়, সেটা হচ্ছে মহররমের ঘটনাকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারণা-প্রসূত বিষয়।

যা হোক, পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা, পবিত্র নবী (সা.) এর হাদীস থেকে দরূদ প্রেরণের প্রতিই মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, যেভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিশ্রুত মসীহ্, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ও বলে গেছেন। পবিত্র নবী (সা.) এবং তাঁর পরিবারের প্রতি ভালবাসা প্রকাশের জন্যে এটা হচ্ছে খুবই সুন্দর এক পন্থা।

হযরত হুসাইন (রা.) এবং তার সাথীরা ঠিক যেভাবে নিশ্চিত-মৃত্যুকে মুকাবিলা করার জন্যে বলিষ্ঠভাবে দন্ডায়মান হয়েছিলেন, মুসলমানদেরও উচিত এজিদ-প্রকৃতির লোকদের সামনে একই ভাবে এই ধৈর্য ও দৃঢ়সঙ্কল্পতা প্রদর্শন করা এবং অটল হওয়া। এক বিরাট সংখ্যক সৈন্যের মোকাবিলা করেও হুসাইন (রা.) সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন; সেহেতু মুসলমানদেরও উচিত, নিজেদের পরিণতি কি হবে, সেটা বিবেচনা না করেও সত্যকে উপস্থাপন করা।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

(৩য় কিস্তি)

হেরা গুহার সেই আকস্মিক মুহূর্তটার আগে তাঁর জীবন ছিল অতি সাদা-সিধে একজন ব্যবসায়ীর জীবন, যিনি নিজের সন্তানাদি নিয়ে হাসিখুশি-জীবন কাটান। এমন একজন নিরীহ মানুষের পক্ষে হঠাৎ করে দুনিয়া কাঁপানো এক ঘোষণা দিয়ে জনতার সামনে হাজির হওয়া, এক বিপ্লবাত্মক দাওয়াত দিতে শুরু করা, এক অতুলনীয় সাহিত্য-সম্ভার সৃষ্টি করা এবং সারা দুনিয়ার প্রচলিত মত ও পথ থেকে আলাদা এক অভিনব জীবন-দর্শন, চিন্তা-পদ্ধতি এবং এক নতুন নৈতিক ও সামাজিক-ব্যবস্থা নিয়ে উপস্থিত হওয়া, নিঃসন্দেহে এটি একটি অতীব-চাঞ্চল্যকর ও অসাধারণ ঘটনা।

একজন মানুষের জীবনে এটা এত বড় পরিবর্তন যে, মানবীয় মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে কোনো বানোয়াট আয়োজন এবং কোনো স্বেচ্ছাভিত্তিক উদ্যোগ বা চেষ্টার ফলে তা কখনো দেখা দিতে পারে না। কারণ, এ ধরণের কোন চেষ্টা, উদ্দ্যোগ, আয়োজন বা প্রস্তুতিকে অনিবার্যভাবে ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের স্তরসমূহ অতিক্রম করেই অগ্রসর হতে হবে। আর সেসব স্তর কখনো কোনো মানুষের সার্বক্ষণিক সঙ্গী-সহচরদের কাছ থেকে গোপন থাকতে পারে না। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন যদি এসব স্তর অতিক্রম করে এগুতো, তাহলে মক্কার শত শত লোক বলে উঠতো, আমরা জানতাম, লোকটা একদিন কোনো না কোনো চাঞ্চল্যকর দাবী তুলবেই। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, মক্কাবাসীরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে আর যত অভিযোগই করুক, এ অভিযোগটা কেউ কখনো উত্থাপন করে নাই।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজে নবুওয়ত লাভে ইচ্ছুক, প্রত্যাশী বা সেজন্য অপেক্ষমান ছিলেন না, বরং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ এ ব্যাপারটার সম্মুখীন হন। ওহীর সূচনাকালীন অবস্থার বিবরণ-সম্বলিত হাদীসগুলোতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত জিব্রাইল (আ.)-এর সাথে প্রথম দেখা হওয়া এবং সূরা আলাকের প্রথম কয়টা আয়াত নাযিলের মাধ্যমে নবুওয়তের উদ্বোধন সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) হেরা পর্বতের গুহা থেকে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীতে উপস্থিত হন। তারপর তাঁর সহধর্মিনীকে বলেন–"আমাকে ঢেকে দাও, আমকে ঢেকে দাও।" কিছুক্ষণ পর যখন ভয় পাওয়ার অবস্থা একটু কেটে গেল, তখন তাঁর জীবন-সঙ্গিনী হযরত খাদিজা (রা.) কে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বললেন, আমার আশংকা হয়, আমি মরে যাবো বা ধ্বংস হয়ে যাবো।

হযরত খাদিজা (রা.) তৎক্ষণাৎ বললেন, কখনো নয়! কখনো নয়! আল্লাহ্ আপনাকে কখনো কষ্টে ফেলবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করে থাকেন, অসহায় ও গরীবদের সাহায্য করেন, অতিথির সমাদার করেন, এবং প্রত্যেক ভালো কাজে সহযোগিতা করেন। তারপর তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে ওরাকা ইবনে নওফেলের কাছে নিয়ে যান। ওরাকা ইবনে নওফেল ছিলেন হযরত খাদিজা (রা.)-এর চাচাতো ভাই এবং আহলে কিতাবের একজন বিশিষ্ট পন্ডিত ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে সমস্ত ঘটনা শুনে নির্বিকার ভাবে বলেন, ইনি সেই বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তা, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আসতেন। হায়! আমি যদি আজ যুবক হতাম এবং সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম, যখন আপনার জাতি আপনাকে জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করে দেবে। নবী করীম (সা.) বললেন, বলেন কি? এরা আমাকে এখান থেকে বের করে দিবে নাকি? ওরাকা জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আপনি যে জিনিস নিয়ে এসেছেন, অতীতে তা নিয়ে যখনই কেউ এসেছে, অমনি দেশবাসী তাঁর শত্রু হয়ে গেছে।

একজন সাদাসিধে মানুষ যখন অপ্রত্যাশিতভাবে এক অত্যন্ত অসাধারণ ও অস্বাভাবিক ঘটনার সম্মুখীন হয়, তখন স্বভাবিকভাবে তার যে ভাবান্তর ঘটতে পারে, এ ঘটনার মধ্যে তাঁর একটা নিখুঁত-চিত্র ফুঁটে উঠেছে। নবী করীম (সা.)-এর যদি আগে থেকেই নবী হওয়ার ইচ্ছা থাকতো, নিজের সম্পর্কে যদি ভাবতেন যে, তাঁর মত মানুষের নবী হওয়া উচিত, আর সেই নবুওয়তের অপেক্ষায় এ ধ্যান-মগ্ন থাকতেন যে, কখন ফেরেশতা আসবে এবং তাঁর কাছে বার্তা বয়ে আনবে, তাহলে হেরা পর্বতের গুহার আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটার

সাথে সাথে তিনি খুশি হয়ে উঠতেন, আনন্দ ও গর্বে উৎফুল্ল হয়ে পাহাড় থেকে নিম্নে সোজা জনগণের মধ্যে পৌঁছে যেতেন এবং উঁচু গলায় নিজের নবুওয়তের কথা বলতেন। কিন্তু তিনি তো খুশী হলেন না, উঁচু গলায় জনগণকে নবুওয়তের সংবাদও জানালেন না? বরং তিনি সেখানে যা দেখলেন, তাতে ভয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন, কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীতে উপস্থিত হলেন, তারপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। মন একটু শান্ত হলে স্ত্রীকে সব ঘটনা খুলে বললেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন, হেরা পর্বতের গুহার মধ্যে আমি দুর্ঘটনার মুখোমুখী হয়েছিলাম, জানিনা আমার কি হবে, আমার জীবন বিপন্ন মনে হচ্ছে। নবুওয়তের আকাংখা-প্রাপ্ত লোকের যে প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা, এটা যে তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

স্বামীর জীবন, তাঁর স্বভাব ও চিন্তাধারা সম্পর্কে স্ত্রীর চেয়ে বেশী কেহ বলতে পারে না। যদি আগে থেকে তার ক জানা থাকতো যে, স্বামী নবুওয়তের অভিলাষী এবং কখন ফেরেশ্‌তা আসবে, তার অপেক্ষায় সর্বদা প্রহর গুণছেন, তাহলে হযরত খাদিজা (রা.) এ ধরণের জবাব দিতেন না। জবাব দিতেন অন্যরকম। তিনি এ কথাই বলতেন যে, ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? এতদিন ধরে যে জিনিসের আকাংখা করে আসছিলেন, তা তো পেয়ে গেছেন, এখন যান, পীর-মুরীদির ব্যবসা জুড়ে দিন। নযর নেওয়াজ আসবে, তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রস্তুতি আমি নিতেছি। কিন্তু পনের বছরের দাম্পত্য জীবনে নবী করীম (সা.)-এর জীবনের যে পরিচয় তিনি পেয়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে এক মহূর্তের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এমন সৎ ও নি:স্বার্থ মানুষের কাছে আর যেই আসুক, শয়তান আসতে পারে না। আল্লাহ্ তাঁকে কোনো কঠিন মুছিবতে ফেলতে পারেন না। তিনি যা দেখেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য।

ওরাকা ইবনে নওফেলের অবস্থাও ছিল সেই রকম। তিনি নবী করীম (সা.)-এর জ্ঞাতি এবং খুবই ঘনিষ্ট সম্পর্কীয় শ্যালক ছিলেন? একজন খৃষ্টান পন্ডিত হিসেবে নবুওয়ত, কিতাব ও ওহী কাকে বলে, তা তিনি জানতেন এবং কৃত্রিম ও মনগড়া জিনিস থেকে আসল জিনিস বেছে বের করার ক্ষমতা রাখতেন। তিনি নবী করীম (সা.)-এর মুখে হেরা পর্বতের ঘটনা শুনে তৎক্ষণাৎ বলে দিলেন, এই আগন্তুক নিশ্চয়ই সেই ফেরেশ্‌তা, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট ওহী নিয়ে আসতেন। এখানে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বিরাজ করছিল। সম্পূর্ণ নিখুঁত ও নিষ্কলুষ চরিত্রের একজন মানুষ। সর্বোতভাবে স্বচ্ছ ও মুক্ত মন তাঁর। তাঁর মধ্যে নবওয়তের অভিলাষ থাকাতো দূরের কথা; নবুওয়ত লাভের জন্য কল্পনাও করেন নাই। সহসা তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান, সচেতন অবস্থায়, প্রকাশ্যে এই অভূতপূর্ব ঘটনার সম্মুখীন হন। এজন্যই ওরাকা কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে, এখানে প্রকৃতির কোনো প্রবঞ্চনা বা শয়তানের কোন প্রতারণা নেই। চেনা এই সত্যবাদী মানুষকে নিজের ইচ্ছা বা অভিলাষ-মুক্ত অবস্থায় দেখেছে। প্রকৃত সত্যের দর্শনই তিনি লাভ করেছেন। ওরাকার এ সিদ্ধান্ত ছিল অংকের মতই নির্ভুল।

নবুওয়তপূর্ব জীবনের সর্বাত্মক সততা, সত্যবাদিতা ও নিরেট নিরক্ষরতার প্রেক্ষাপটে এমন আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে ওহী নাযিল হওয়া নবুওয়তের সত্যতার এমন এক উজ্জ্বল প্রমাণ, যাকে অস্বীকার করা যে কোনো বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। কুরআনে একাধিক স্থানে একে নবুওয়তের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। যেমন সূরা ইউনুসে আল্লাহ্ বলেন–

"কুল লাও শা-আল্লাহু মা-তালাও তুহু আলাইকুম ওয়ালা আদরাকুম বিহি ফাকাদ্ লাবিছতু ফীকুম ওমরামমিন্ কাব্‌লিহি আফালা তা'কিলুন।"

অর্থাৎ তুমি বল, আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে আমি এ (ঐশী) বাণী তোমাদের পড়েও শুনাতাম না এবং তিনিও এ (শিক্ষা) সম্বন্ধে তোমাদের জানাতেন না। নিশ্চয় এ (নবুওয়তের) দাবীর পূর্বেও আমি তোমাদের মাঝে এক দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছি। তবুও কি তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না? (সূরা ইউনুস: ১৭)

কুরআনের সূরা আশ্-শূরায় আল্লাহ্ পাক বলেন– ***"মা-কুনতা তাদ্‌রী মালকিতাবু ওয়ালাল ঈমানু ওয়ালাকিন জায়ালনাহু নূরন্নাহ্‌দী বিহি মান্নাশাউ মিন ইবাদিনা।"***

অর্থাৎ কিতাব কী এবং ঈমান কী, তুমি তা আদৌ জানতে না । কিন্তু আমরা এ (বাণীকে) জ্যোতি বানিয়েছি (এবং) এর মাধ্যমে আমরা আমাদের বান্দাদের মাঝে যাকে চাই হেদায়াত দেই (সূরা আশ শুরা: ৫৩)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র, নিষ্কলুষ-জীবন, সাহাবায়ে কেরামের চরিত্রের ওপর তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার বিস্ময়কর প্রভাব এবং কুরআনের আলোচ্য বিষয় সমূহ এসব অত্যন্ত উজ্জ্বল নিদর্শন। যে ব্যক্তি নবীদের জীবনবৃত্তান্ত এবং আসমানী কিতাব সমূহের শিক্ষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাঁর পক্ষে এসব নিদর্শন দেয়ার পর হযরত নবী করীম (সা.)-এর নবুওয়তের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা অত্যন্ত কঠিন।

যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ***"রাসূলুম মিনাল্লাহি ইয়াত্‌লু ছুহুফাম মুতাহ্ হারাতান। ফীহা কুতুবুন কাইয়্যেমাহ।"***

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন রসূল পবিত্রকৃত ঐশী পুস্তকাবলী পড়ে শুনায়। এতে চিরস্থায়ী শিক্ষা রয়েছে (সূরা আল-বাইয়্যেনাহ: ২-৩)।

এখানে নবী করীম (সা.)-এর ব্যক্তি-সত্তাকে একটা উজ্জ্বল প্রমাণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা তাঁর নবুওয়তের পূর্বাপর-জীবন নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের মত গ্রন্থ উপস্থাপন, তাঁর শিক্ষা ও সাহচর্যের প্রভাবে মু'মিনদের জীবনে অস্বাভাবিক বিপ্লব দেখা দেয়। সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত আকীদা, বিশ্বাস, অত্যন্ত নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন ইবাদত, উৎকৃষ্টতম নির্মল-চরিত্র এবং মানবজীবনের জন্য সর্বোত্তম নীতিমালা ও বিধান শিক্ষা দান। হযরত নবী করীম (সা.)-এর কথা ও কাজে পরিপূর্ণ সংগতি ও সামঞ্জস্য এবং সব রকমের বিরোধিতা ও বাধা-বিপত্তির মোকাবেলায় অটুট মনোবল ও অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে নিজের দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখা, এসব অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর আল্লাহ্ পাকের রাসূল হওয়ার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

(চলবে)

masumon83@yahoo.com

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর হাজারো নিদর্শন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.)

মোজাফফর আহমদ রাজু

পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ্ আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর নূর। তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত একটি তাকের ন্যায়, যেখানে রয়েছে একটি প্রদীপ। সে প্রদীপটি রয়েছে গোলাকার কাঁচের চিমনিতে। সে কাঁচ এমনিই জ্বলজ্বলে যেন তা একটি উজ্জ্বল তারকা। সে প্রদীপটি এমন এক বরকতপূর্ণ যায়তুন বৃক্ষের তেল দিয়ে প্রজ্জ্বলিত, যা প্রচ্যেরও নয় এবং পাশ্চাত্যেরও নয়, বরং সেটি সারা বিশ্বের)। এ (বৃক্ষের) তেল এমন যে, আগুন এটিকে স্পর্শ না করলেও এটি নিজে নিজেই জ্বলে ওঠবে। নূরের উপর নূর! আল্লাহ্ যাকে চান, নিজের নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ (সূরা আন নূর)।

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক এ-যুগে আগমনকারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.) আগমন করেছেন। আগমনকারী মহাপুরুষ তাঁর লেখনীতে বহু জায়গায় ব্যক্ত করেছেন যে, 'আমি ও আমার অনুসারীগণ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত-দাস, গোলাম। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন সূর্য, আমি হলাম তাঁরই অনুসরণকারী চন্দ্র। আখেরী যুগে আগমনকারী সত্য-মাহ্‌দী (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পায়রবি করা ছাড়া কোন ধরনের পদমর্যাদা লাভ করা কোন ভাবেই সম্ভব তো নয়ই, অপর দিকে আল্লাহ্ তাআলার প্রিয়-বান্দা হতেও চির বঞ্চিত। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ মসীহ্ ও মাহদী (আ.) সমস্ত দুনিয়ার মালিক ও মাওলার কসম খেয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন, আমি ও আমার জামাত হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে সকল দিক থেকে মান্য করি এবং তিনি ছাড়া আমার ও আমার জামাতের কোন গুরুত্ব ও অস্তিত্ব নেই। সমস্ত দুনিয়ার মানবীয় কাঠগড়ায় আমাদের জামাতের পক্ষ থেকে সোয়াশো বৎসর যাবৎ যুক্তি প্রমাণ তুলে ধরা হচ্ছে যে, আমরা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্, খাতামান নবীঈন, খায়রুল মুরসালিন (সা.)কে পূর্ণরূপে মানি, আনুগত্য করি, ভালবাসি, বা তিনি (সা.) ছাড়া আমাদের সব মাকাম-মর্যাদাকে তুচ্ছ জ্ঞান করি।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার কিতাবাদিতে হাজার হাজার এমন শব্দ রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) শেষ শরীয়ত ওয়ালা নবী বা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, তাঁর পরে এমন কোন নবী হবে না, যাকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পায়রবী ছাড়া কোন ধরনের মাকাম-মর্যাদা প্রদান করা হবে। আমি এখন যে লেখাগুলো তুলে ধরবো, তা মসীহ্ ও মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর বিভিন্ন কিতাবাদি থেকে চয়ন করা। যার বিবেক আছে, তিনি এই লেখাগুলো মনোযোগসহ পাঠ করলে অবশ্য অবশ্যই বুঝতে কঠিন হবে না যে, আহমদী জামাতের মূল ভিত্তিই হল সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেন, মুহাম্মদ (সা.) এর পক্ষ থেকেই সকল কল্যাণ লাভ করেছি। তিনি (সা.)ই আমার গৌরব। মুহাম্মদ (সা.)ই আমার শিক্ষাদাতা। মুহাম্মদ (সা.)ই সর্বোচ্চ নূর, আমি সেখান থেকেই নূর লাভ করেছি। মুহাম্মদ (সা.) পরিপূর্ণ মানব ছিলেন, তাঁর (সা.) এর নিকট থেকেই পূর্ণ মানব হওয়া শিখেছি। মুহাম্মদ (সা.) এর মধ্যে এমন গুণ ছিল, যা ফিরিশ্‌তাদের মধ্যেও ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে বা চন্দ্র, সূর্যেও ছিল না। মুহাম্মদ (সা.) হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল। মুহাম্মদ (সা.) পূর্ণতম মানব ছিলেন। মুহাম্মদ (সা.) সুন্দরতম অস্তিত্বে বীর পাহলোয়ান ছিলেন, সকল নবীদের নেতা ছিলেন, অমর জীবন প্রাপ্তগণের নেতা ছিলেন। তাঁর (সা.) মর্যাদা সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তিনি ছিলেন আমাদের হাদী বা পথ প্রদর্শক। তিনি এমন এক নবী ছিলেন, যে সত্য ও সত্যতায় পরীক্ষিত-নবী। তাঁর উচ্চ-অবস্থান ও মোকামের সীমা মানবীয় গুণে কল্পনাও করা যায় না। তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করার দরকার ছিল, দুনিয়ার মানুষ সেভাবে সনাক্ত করেনি। তিনি (সা.) সেই বীর-পুরুষ, যিনি পুনরায় আল্লাহ্‌র একত্ব দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে আউয়ালীন ও আখেরীনদের উপরে উন্নীত করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এমন নবী, যার কাংখিত সকল প্রত্যাশাই তাঁর (সা.) জীবনে পূর্ণ করেছেন। তাঁর (সা.) কৃপা ও কল্যাণ বা ফয়েজকে যে ব্যক্তি স্বীকার না করে কোন রকম শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে, সে মানুষ নয়। তাঁকে (সা.) সকল শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত তৌহিদ আমি (মির্যা সাহেব) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমেই লাভ করেছি। আমি জিন্দা (খোদার) আল্লাহ্‌র পরিচয় পেয়েছি মুহাম্মদ (সা.) এর চরণের মাধ্যমে। আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কথা বলা ও সম্বোধিত হওয়ার যোগ্যতা মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্যে লাভ করেছি।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্যেই আমি আল্লাহ্ তাআলার অতি উজ্জ্বল চেহারা প্রত্যক্ষ করি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন গৌরব ও পবিত্রতার সিংহাসনে সমাসীন নবী। তাঁর (সা.) আনুগত্যে আমি সর্বদা রুহুল কুদ্দুসকে লাভ করে থাকি। তাঁর (সা.) মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান ও পুনরুত্থান সংঘটিত হয়েছে। তাঁর (সা.) আগমনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রথম কেয়ামত প্রদর্শিত হয়েছে, যা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত জগতকে পুনরায় জীবন্ত হয়েছে। তিনি (সা.) হলেন নবীগণের নেতা, রসূলগণের গৌরব। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তো এমন নবী, সকল প্রেরিত পুরুষগণের মাথার মুকুট। মুহাম্মদ (সা.) এর ছায়ার মধ্যে দশ দিন চললে, হাজার বছরের আলো লাভ করা যায়। তিনি (সা.) নবীগণের মোহর, মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তাঁর (সা.) আনুগত্য করলে অন্ধকারের সব আবরণ খসে পড়ে এবং এই জগতেই প্রকৃত পরিত্রাণ বা নাজাতের চিহ্ন ও প্রভাব প্রকাশিত হয়। তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবীতে কোটি কোটি স্বভাবের মানুষ অতীত হয়েছে, কিন্তু মুহাম্মদ (সা.) হলেন তাদের সেরা। মুহাম্মদ (সা.) এর ভালবাসা খোদা দর্শনের আয়না ছিল।

(চলবে)

এক চরম বিদ্বেষীর সত্যের অকপট স্বীকারোক্তি

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর দাওয়াতুল আমীর পুস্তকের ১০৬-১০৭ পৃষ্ঠায় বলেন:

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সম্পর্কে সে- যুগে মানুষ যে-ধরনের মনোভাব পোষণ করত, তদ্‌সংক্রান্ত একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। এটি এমন এক ব্যক্তির লেখায় প্রকাশ পেয়েছে, যে পরে তাঁর চরম বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাঁর দাবীর পর সে-ই সর্বপ্রথম তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া প্রদান করে। এই ব্যক্তি কোনো সামান্য মানুষ নয়; বরং, আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের নেতা ও কর্তা মৌলভী মোহাম্মদ হোসেইন বাটালভী সাহেব, যিনি মির্যা সাহেবের রচিত গ্রন্থ 'বারাহীনে আহমদীয়া' সম্পর্কে পর্যালোচনা লিখতে গিয়ে স্বীয় পত্রিকা 'ইশাআতুস সুন্নাহ্'-তে তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন:

'বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের প্রণেতা মির্যা সাহেবের জীবন-চরিত ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আমরা যতদূর জানি, সমসাময়িক লোকদের মধ্যে এমন মানুষ খুব কমই আছে, যারা এতটা জানে। লেখক এবং আমরা একই অঞ্চলের অধিবাসী; বরং জীবনের শুরু থেকেই (যখন আমরা কুরতুবী এবং শরাহ্ মুল্লাহ্ পড়তাম) তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর এবং আমার মাঝে পত্র-বিনিময়, দেখা-সাক্ষাত ও ভাবের আদান-প্রদান অব্যাহত আছে। তাই, আমাদের একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, আমরা তাঁর অবস্থা সম্পর্কে খুব ভালভাবেই অবহিত।

আমার মতে এই গ্রন্থ (হযরত সাহেবের গ্রন্থ– বারাহীনে আহমদীয়া- অনুবাদক) এযুগে বিরাজমান পরিস্থিতির নিরিখে এমন এক গ্রন্থ , যার সমতুল্য রচনা ইসলামে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি; আর ভবিষ্যতেও হবে কিনা জানা নেই। لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا (সূরা আত্ তালাক: ২)

এর প্রণেতা প্রাণ-সম্পদ, রচনাবলী ও বক্তৃতাসমূহ তথা স্বীয় পবিত্র-জীবনাচরণের মাধ্যমে ইসলাম-সেবায় এমন অবিচল প্রমাণিত হয়েছেন যে, এর দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী মুসলমানদের মধ্যে অতি বিরল।

আমার এসব কথাকে কেউ প্রাচ্যের অতিরঞ্জন মনে করলে আমাকে অন্তত এমন একটি গ্রন্থের নাম বলে দিক, যাতে ইসলামের সকল বিরোধী-সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে আর্য ও ব্রাহ্ম সমাজের এমন জোরালো খন্ডন থাকবে এবং ইসলামের এমন দু'চারজন সেবকের সন্ধানও দিক, যারা ধন-প্রাণ এবং কথা ও লেখার মাধ্যমে ইসলামের সাহায্যের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেয়া ছাড়াও আদর্শগত ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে ইসলামের পক্ষে দন্ডায়মান হয়েছেন। আর ইসলাম-বিরোধী ও ইলহামে অবিশ্বাসীদেরকে পাল্টা বীরত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে থাকবেন, ইলহাম হওয়া সম্পর্কে যার সন্দেহ রয়েছে– সে আমার কাছে এসে এর অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ করতে পারে; আবার এই অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ-দর্শনের স্বাদ বিজাতীয়দেরকেও আস্বাদন করিয়ে থাকবেন।' (ইশা'আতুস সুন্নাহ্, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ১৬৯-১৭০)

(বাংলা ডেস্ক লন্ডন এর সৌজন্যে)

বাবা-মায়ের সন্তুষ্টিই কল্যাণের উৎস

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

পিতা-মাতার বিষয়ে অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন, তা হয়তো আপনারা পাঠ করে থাকবেন। বাব-মা, ভাই-বোনদের নিয়ে গঠিত হয় আমাদের পরিবার। এই পরিবারের সবাই যদি সুন্দর ভাবে নিজেদের মাঝে ভালবাসা ও মহব্বত-সুলভ ব্যবহার করে, তাহলে প্রতিটি পরিবারে আধ্যাত্মিক- পরিবেশ তৈরী হতে পারে। পরিবারের চাহিদা মিটাতে কর্ম করতে অনেক সময় ছেলেদের অন্যত্র যেতে হয়। এর মানে এটা নয় যে, পিতা-মাতাকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করে নিজের বিবি-বাচ্চাদের নিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে। দূর থেকেও পিতা-মাতার যথেষ্ট সেবা করার সুযোগ থাকে। প্রত্যেক সন্তানকে মনে করতে হবে যে, আজ পিতা-মাতার বদৌলতেই আমরা এই সুন্দর-পৃথিবীতে আসতে পেরেছি। পিতা-মাতা আমাদের মানুষ করে গড়ে তুলার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে কেউই সুখী হতে পারে না। এ কথাটা সর্বদা মনে রাখতে হবে। মানব-শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে অসহায় থাকে। জন্ম গ্রহণের আগে ৯ মাস বা তার চেয়ে বেশী সময় সে মায়ের পেটে থাকে। সন্তান-সম্ভবা মাকে এ সময় অসীম কষ্ট ভোগ করতে হয়ে। আর প্রসব-যন্ত্রণার কষ্ট তো রয়েছেই। প্রতিটি বাবা-মা সন্তান লালন পালনে অসামন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। মা নিজে অনাহারে থেকেও সন্তানকে খাওয়ান। তাকে রক্ষায় বাবা-মা জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকেন। তাই প্রতিটি সন্তানের উচিত, তার বাবা-মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। বাবা-মায়ের কাছে সন্তানের যে ঋণ, তা সারা জীবন সাধনা করলেও শোধ হওয়ার নয়।

মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন মজিদের সূরা বনী ইসরাঈল এর ২৪-২৫ আয়তে বলেছেন, 'আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক একমাত্র তারই ইবাদত করার এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন। তাদের (জীবদ্দশায়) একজন বা উভয়েই বার্ধকে উপনীত হলে তুমি তাদের উদ্দেশ্যে (বিরক্তিসূচক) 'উহ্'ও বলো না এবং তাদেরকে বকাঝকা করো না, বরং তাদের সাথে সদা বিনম্র ও সম্মানসূচক কথা বলো'।

'আর তুমি মমতাভরে তাদের উভয়ের ওপর বিনয়ের ডানা মেলে ধর। আর (দোয়ার সময়) বলবে, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি সেভাবে দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমায় লালন-পালন করেছিলেন।

এ ব্যাপারে হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর অনেক হাদীস রয়েছে, বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধাবোধ এবং আনুগত্য পারিবারিক এবং সামাজিক-জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে। আর এ ভালবাসা এবং শ্রদ্ধাবোধ মানুষকে সুস্থ ধারায় পরিচালিত করে। বাবা-মায়ের প্রতি যে শ্রদ্ধাশীল, সে সমাজের সাথে ভাল আচরণ দেখাবে, এমনটিই আশা করা হয়। বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি, তা অনুভব করতে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, "একদা একজন লোক হযরত নবী করীম (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানবজাতির মধ্যে কোন্ ব্যক্তি আমার নিকট সদয় ব্যবহার ও উত্তম সাহচর্যের সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত?' উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার পিতা, তারপর তোমার নিকটাত্মীয়গণ' (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত হতে)।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বাবা-মায়ের সন্তুষ্টির ওপর শুধু ইহলৌকিক কল্যাণই নয়, পারলৌকিক কল্যাণও নিহিত। পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট থাকলে, তাদের অন্তরে ব্যথা দেয়ার কাজ করলে নামায-রোযা করেও হাশরের দিন পার পাওয়া যাবে না। পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশনা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে বিভিন্ন সময়েই।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'মাতা-পিতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং মাতা-পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি নিহিত। (তিরমিযী)। ইসলামী বিধানে বাবা-মায়ের হক আদায়কে কার্যত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। হযরত আমার বিন মুররা আনজুহানী (রা.) বলেন, এক লোক নবী করীম (সা.)-এর দরবারে এসে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)! যদি আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, রোযা রাখি, যাকাত দেই এবং হজ্জ সম্পাদন করি, তাহলে আমি কি পাব? জবাবে তিনি বললেন, সঠিক ভাবে যে এগুলো আদায় করে, সে নবীগণ, সিদ্দিকীন, শহীদান ও সালেহদের সাথী হবে। তবে পিতা-মাতার অবাধ্যাচারী এ পুরস্কার পাবে না (আহমদ তিবরানী)।

আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কর্তব্য ও পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য, এই দুই কর্তব্যের মধ্যে যদি কখনো দ্বন্দ্ব বাধে, তাহলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রতি কর্তব্যকে প্রাধান্য দিবে। কেননা, এ-ক্ষেত্রে এটা হবে তার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি এই কর্তব্য করতে গিয়ে যদিও তাকে পিতা-মাতার অবাধ্য হতে হয়, তথাপি এ অবাধ্যতার মধ্যেও সন্তানকে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, শালীনতা ও নম্রতার ব্যবহার করতে হবে। পার্থিব ও সাংসারিক বিষয়ে তাদের অবাধ্যতা বা অশালীন-ঔদ্ধত্য নিষিদ্ধ। মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের নম্রতা কোমলতা, দয়া, ভালবাসা ও শালীনতা বজায় রাখতে হবে।

সুতরাং দেখুন, ইসলাম আমাদেরকে কত সুন্দর রীতি-নীতি শিখিয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা সূরা আহকাফের ১৬ আয়াতে বলেন, আর আমরা মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টের সাথে তাকে জন্ম দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর রচিত পুস্তক কিশ্‌তিয়ে নূহ্-তে বলেছেন, "যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সম্মান করে না এবং সাধারণ বিষয়, যা কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়, তাদের আদেশ পালন করে না এবং তাদের প্রতি আদিষ্ট সেবা সম্বন্ধে অবহেলা করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়"।

পিতা-মাতার সম্মান করা, আনুগত্য করা, তাদের সেবা-যত্ন করা, তাদের নির্দেশনা মেনে চলা, এসব কিছুই ইসলামী বিধি-বিধানের মধ্যে পড়ে। সুতরাং সকল মু'মিন মুসলমানদের এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কোন অবস্থা বা পরিস্থিতিতেই যেন আমরা পিতা-মাতাকে ভুলে না যাই। পিতা-মাতা যেমন সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়া করে থাকেন, তেমনিভাবে পবিত্র কুরআন পিতা-মাতার জন্যও দোয়ার কথা বলেছেন। দোয়াটি হলো–*"রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি সাগিরা"*। যখনই সুযোগ হবে, অন্যান্য দোয়ার সাথে আমরা যেন এই দোয়াটিও পাঠ করি। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে নিজ নিজ পিতা-মাতার হক আদায় অর্থাৎ তাদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন, তাদের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করা এবং তাদের প্রতি অনুগত থাকার তৌফিক দান করুন, আমীন।

প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(২য় কিস্তি)

মোহাম্মদ ওসমান গনি

এ স্কুলটি তাদের বাড়ি থেকে আট কিলোমিটার দূরে বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার অন্তর্গত পাকুটিয়া গ্রামে অবস্থিত। অত্র এলাকার এক হিন্দু জমিদার কর্তৃক ১৯১৬ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর কিছুদিন তিনি এক আত্মীয়ের বাড়িতে লজিং ছিলেন। গৃহ-শিক্ষক হিসেবে বাড়ির ছেলেমেয়েদের জাগতিক ও ধর্মীয়, উভয় শিক্ষায় আলোকিত মানুষ হওয়ার পথ প্রদর্শন করেছেন। ফলে এলাকায় একজন আদর্শ-শিক্ষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সকলের সাথে তাঁর গভীর আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। পরে পিতা তাঁকে স্কুলের হোষ্টেলে থাকার ব্যবস্থা করেন। তখন তাঁর দু'বছরের ছোট ভাই আওলাদ হোসেনকে এ স্কুলে ভর্তি করা হয়। ফলে দুই ভাই হোষ্টেলে থেকে লেখাপড়া করতে থাকেন।

পাকুটিয়া স্কুলে লেখাপড়ার শুরুতেই তাঁর স্বভাব-সুলভ বিনয়ী ব্যবহার, ধর্মের প্রতি অনুরাগ এবং মানব সেবা প্রত্যক্ষ করে সবাই মুগ্ধ হন। অল্পদিনের মধ্যে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ভাল মানুষ হিসেবে ছাত্র শিক্ষকদের দৃষ্টিনন্দিত হন। মসজিদে আযান হলেই নামাযের জন্য ছুটে যাওয়া তাঁর ব্রত ছিল। একনিষ্ঠতার সাথে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। স্কুলের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলের কর্মসূচিকে সার্থক ও সফল করতে তিনি অন্যান্যদের সাথে নিরলস ভাবে কাজ করেছেন। ছোট ভাইসহ স্কুলের ছেলেদেরকে নামায পড়তে এবং ধর্মীয় পুস্তক পাঠে জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে জাগতিক শিক্ষার চেয়ে ধর্মীয়-জ্ঞান আহরণে তাঁর প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। স্কুলের পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নের চেয়ে ধর্মীয় বিভিন্ন পুস্তক পাঠে মগ্ন থাকতেন। সমাজে ইসলামের নামে অনৈসলামিক কাজ প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত হতেন। কিভাবে মুসলমান সমাজে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বাস্তব রূপ দেওয়া যায়, তা নিয়ে গভীর ভাবে ভাবতেন। ফলে পার্থিব-জীবনে প্রথিতযশা হওয়ার সাধনার প্রতি তাঁর অনিহা জন্মে। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ তাআলার শিক্ষা:–

পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক এবং আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য পরকালের আবাস নিশ্চয় উৎকৃষ্টতর। তবুও কি তোমরা বুদ্ধি খাটাবে না? (আল আন্আম ৬ : ৩৩)। তাই তাক্ওয়া অবলম্বনে বুদ্ধি খাটানোর মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতের শুভ-সংবাদ পান। ফলে জামাতে আহমদীয়ার সত্যতা আহরনে বিভিন্ন পুস্তক পাঠ করতে থাকেন। এ অবস্থার মাঝে স্কুলে অধ্যয়নের ক্রমধারায় ১৯৫১ সালে মানবিক বিভাগ থেকে মেট্রিক বর্তমান এস, এস, সি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু জাগতিক শিক্ষার প্রতি তাঁর অমনযোগিতার কারণে পরীক্ষার ফলাফল

ভাল হয়নি।

এতে অভিভাবকরা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে মাতাপিতা দু:শ্চিন্তাগ্রস্থ হন। যার উপর এত আশা আকাঙ্খা ছিল, সে কেন সংসার বিরাগী হয়ে গেল! তাই মাতাপিতা তাঁকে পুনরায় পরীক্ষা দেয়ার জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু খোদার প্রেমে বিভোর তাঁর অনুসন্ধানী-মন জাগতিক শিক্ষার প্রতি আর আকৃষ্ট হয়নি। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আখেরী জামানায় আবির্ভূত ইমামুজ্জামান হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর দাবীর সত্যতা যাচাইয়ে তার মন প্রাণ উতলা হয়ে যায়। ফলে তাঁর আর কোন জাগতিক ডিগ্রি অর্জিত হয়নি।

ধর্মের প্রতি অনুরাগ

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেন,–'নবজাতক শিশুর কানে আযান ও তকবীর বলা হোক, যেন জন্মের সাথে সাথে তার মনে খোদা তাআলার তৌহিদ (একত্ববাদ) ও নবুয়াতের বাণী পৌঁছে যায়। যার ফলে শারীরিক ক্রমবিকাশের সাথে সাথে খোদার দাস হওয়ার যোগ্যতাও তার মধ্যে জন্মাতে আরম্ভ করে'। তাই ওসমান গনির জন্মের পর পবিত্র চিত্তের অভিভাবক তাঁর দুই কানে যে আযানের ধ্বনী শুনান, তা আতুড় ঘরে বোধগম্য না হলেও শৈশব থেকেই প্রতিফলিত হয়। পবিত্র কুরআন ও নামায শিক্ষার জীবনের শুরুতে হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে। 'আল্লাহু আকবার' অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, ইত্যাদি ঐশীবাণীর যথার্থতা তাঁর পবিত্র মনে দানা বাঁধে। ফলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শিক্ষা অনুযায়ী তিনি শৈশব থেকেই ধর্মপরায়ণ, পবিত্র-মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেন। ইসলামী আকিদা, শিষ্টাচার, নৈতিকতা ও ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনে সুবোধ-বালক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

বলাবাহুল্য, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলতেন, 'আমি আমার মায়ের গর্ভে বসে কুরআন শুনেছি'। আমাদের ওসমান গনি তাঁর মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় পুণ্যবতী মা নামায, রোযাসহ যেসব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করেছেন, তা তাঁর জীবনে প্রস্ফুটিত হয়।

ধুল্যা হাই স্কুলে অধ্যয়নকালে পিতা স্কুলের মৌলভী শিক্ষককে তার বাড়িতে ছেলেমেয়েদের ধর্মীয়-শিক্ষা প্রদানের জন্য লজিং রাখেন। ফলে ওসমান গনি এ গৃহ-শিক্ষক থেকে ধর্মীয় তালিম-তরবিয়ত লাভ করেন। নামায ও কুরআন শিক্ষা থেকে শুরু করে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্নমুখী জ্ঞান আহরণ করেন। ফলে ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ সৃষ্টি হয়। উত্তম চারিত্রিক-বৈশিষ্টের অধিকারী, আদর্শবান, ধার্মিক ও সমাজ সেবক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি গ্রামের বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত হতেন। এমনকি দূর-দূরান্তে বিভিন্ন গ্রামে কোন ওয়াজ মাহফিলের খবর পেলে তিনি বিভিন্নজনকে সাথে নিয়ে ছুটে গেছেন। গভীর রাত জেগে মনযোগের সাথে ওয়াজ নসিহত শুনেছেন।

এসব ধর্মীয়-অনুষ্ঠানে আখেরী জামানায় হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আবির্ভাব

এবং তাঁর মান্যতার আবশ্যকতার কথা বর্ণিত হতো। এছাড়া কাদিয়ানীরা কাফের, তারা হযরত রসূল করীম (সা.)কে শেষ-নবী মানে না এবং তাদের কলেমা ভিন্ন, ইত্যাদি বিভিন্ন বয়ান উগ্রবাদী মৌলভীদের নিকট শুনেছেন। তবে মৌলভীদের নসিহত এবং বাস্তবে ইসলামের শিক্ষা থেকে তাদের বিচ্যুতি প্রত্যক্ষ করে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। তাদের মুখের বয়ান ও বাস্তব-আদর্শ ভিন্ন। সমাজের স্বার্থান্বেষী মৌলভীরা একে অপরের প্রতি কুফরী ফতোয়ার ঝড় তোলে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শিক্ষা বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত। মানুষ পার্থিব-জীবনে বিভোর। তাই তিনি প্রকৃত-ইসলামের শিক্ষাকে আহরণ এবং সিরাতাল মোস্তাকিমের পথের সন্ধান নিয়ে গভীরভাবে ভাবতেন, দোয়া করতেন। তাঁর পবিত্র চিত্তে অনুসন্ধানী-মনে সত্যতা উদঘাটনের অনুপ্রেরণা জন্মে। কোথায় আছে ঐশী নূরে প্রজ্জ্বলিত মানব-জীবনের প্রশান্তির ধর্ম আল-ইসলামের বাস্তব রূপ!

(চলবে)

কবিতা-

"সত্যের সন্ধানে"

আলমগীর কলিন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সত্যের সন্ধানে এম.টি.এ. তে জগতবাসী দেখ দিন রাতে
ঘুমিয়ে থেকোনা আর ঘুমের ঘোরে "ইসলাম হল ভাই সবার উপরে"
প্রশ্ন কর আছে হৃদয়ে যত,
কুরআনের উত্তর সঠিক ব্রত।

রিয়েল টক এন্ড ফেইথ মেটার দেয় ইংলিশ প্রশ্নের লিগেল আনসার
উর্দুভাষী ও হিন্দিভাষীদের রাহে হুদা দেয় সহী উপহার
যার যে ভাষায় প্রশ্ন করে
সৎকর্মশীল জীবন গড়ে।

আল্লাহ্‌র খিলাফত মাহ্‌দীর মারফত পুণরায় ভবে এলে
আল্লাহ্‌র মনোনীত খলীফাদের হাতে এম,টি,এ চ্যানেল বিশ্বে খুলে
সৎকর্মশীল আছে যারা
আল্লাহ্‌র খিলাফত পায় তারা।

ইসলামে বহু দল, আসলটা কোন দল, এদিক সেদিক ঘুরে হবে না যাচাই
দ্বিধাদ্বন্দ্ব যত, ফেতনা হল তত, "কুরআন হল যে আসল উপায়"
লজ্জা ত্যাগ করে তাক্‌ওয়া ধর
কোনটা সঠিক পথ যাচাই কর।

আছে বহু ছদ্মবেশী, সুন্নতী লেবাসী স্বার্থপরতার হাত ধরে
মিথ্যা প্রতিভায় জগতকে ভুলায় ধর্মকে ব্যবসার পুজি করে,
ইসলাম নামধারী ধোকাবাজরা
সত্যকে ঢাকতে চায় মিথ্যা দ্বারা।

মিথ্যাবাদীর দলে সর্বদা বিফলে, কুরআনের বিধানে তাই বলে
ধর্মলুটেরা ধোকাবাজ যারা হিংসায় যেন তারা উঠে জ্বলে
খিলাফত ধ্বংশের নায়ক যারা
সকলেই নিঃশেষ হল তারা।

মৌলবাদীর দল ভুট্টোকে দেয় বল, ইসলামের খলীফা হবে ফয়সল
একেতো বাদশা আরো হবে খলীফা, পদবী লোভে হয়ে যায় দুর্বল
আল্লাহ্, পথের কাটা সাফ করলেন
ভাতিজার হাতে তারে মৃত্যু দিলেন।

ভুট্টো দলে-বলে, দিশেহারা হলে, পূণর্বার শয়তানী ফন্দি আটায়
আহমদী খিলাফত দংশনে দিল মত, অমুসলিম আইন পাস করল তাই
আল্লাহ্ কুদরতি রশি পাঠালেন
ফাসিতে ঝুলিয়ে তাকে মৃত্যু দিলেন।

জিয়াউল হক পরে শক্ত হাতে ধরে, ভুট্টোর আইন খানা তামিল করে
আল্লাহ্‌র খলীফা চাইলে মোবাহালা, জিয়াউল-চ্যালেঞ্জ কবুল করে।
আল্লাহ্ এমন এক ঝলক দিলেন
বিমান বিধ্বংসে জ্বালিয়ে দিলেন।

হিংসায় নিঃশেষ, কুরআনের নির্দেশ 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন'
খলীফার হাত ধর, কুরআন শ্রবণ কর, সত্য জেনে হও মু'মিন
সত্যের পথ অনুসরণ কর,
সত্যের সন্ধান লাভ কর।

সত্যের সন্ধানে এম.টি.এ-তে জগতবাসী দেখ দিন রাতে
ঘুমিয়ে থেকোনা আর ঘুমের ঘোরে "ইসলাম হল ভাই সবার উপরে"

শোক সংবাদ

(১) অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বানিয়াজানের জনাব আবুল কালাম আজাদ ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৩ অক্টোবর রাত ৮টার সময় ঢাকা ইসলামিয়া হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লা ইলাইহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৩৮ বৎসর। মরহুম এক স্ত্রী, এক কন্যা-সন্তান, দুই ভাইসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুম ১৯৯৪ সালে বয়আত করেন, তখন থেকেই দীর্ঘদিন খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদের দায়িত্বে ছিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্থানীয় জামাতের জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্বে ছিলেন। তিনি নিয়মিত মাসিক রিপোর্ট পাঠাতেন। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন, নিয়মিত চাঁদাও দিতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোন চাঁদা বকেয়া নাই। অত্র অঞ্চলের বহু মানুষের সঙ্গে মরহুমের সুসম্পর্ক ছিল, যার কারণে বহু গয়ের আহমদী মেহমান তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেন।
আমরা মরহুমের রূহের মাগফেরাতের জন্য সকল আহমদী ভাই ও বোনদের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান (মোয়াল্লেম)

(২) অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নিউসোনাতলা (বগুড়া)-এর সদস্য মোহাম্মদ খোকা প্রামানিক এর ছেলে মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম (খাকসারের) ভাতিজা গত ১২/১১/২০১২ তারিখ রোজ সোমবার সকাল ৯ ঘটিকার সময় পাওয়ার টিলার মেশিন এর সাথে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে তৎক্ষনাৎ ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ২৯ বৎসর। তিনি একজন জন্মগত আহমদী ছিলেন। তিনি জামাতের কায়েদ ছিলেন। স্থানীয় জামাতে রাত ৮টায় তার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ১০০০ আহমদী ও অ-আহমদী অংশগ্রহণ করেন এবং দাফন পর্যন্ত ছিলেন। মরহুমের রূহের মাগফিরাতের জন্য সকল ভাইবোনদের কাছে খাস দোয়ার আবেদন করছি এবং আল্লাহ্ তাআলা মরহুমের পরিবারকে সাবরে জামিল দান করুন, আমীন।

মোহাম্মদ আলী, নিউসোনাতলা

গত ০৮/০৫/১২ ডোহান্ডা জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব হাকীম উদ্দীন শাহ প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, ৫ মেয়ে, ৩ ছেলে, ২১ জন নাতী, নাতনী এবং ১৪ জন পুঁতী রেখে চির বিদায় নেন। তিনি প্রায় ৪০ বৎসর ডোহান্ডা জামাতের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মরহুম সর্বদা হাসিমুখী, মেহমান নেওয়াজী ছিলেন। কোন আহমদী ভাই বোন তাঁর বাড়ীতে গেলে কিছু না খাইয়ে বিদায় দিতেন না। মরহুম এলাকাতে জনপ্রিয় লোক ছিলেন। গয়ের আহমদী শত শত লোক তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। তার কোন সজন আল্লাহ্‌র ফজলে গয়ের আহমদীর সাথে বিবাহ দেন নাই। মসজিদ এবং মোয়াল্লেম কোয়াটারের সাথে জমি তিনিই দান করেছেন। জামাতের যে কোন আহমদী তার বাসায় গিয়েছেন, সবাই মরহুমের মেহমান নেওয়াজীর তারিফ করতেন। এলাকার সরকারী কর্মকর্তা, নেতা-নেত্রীরাও তাকে একজন ফেরেশ্‌তা তুল্য লোক মনে করতেন। মরহুমের রূহের মাগফিরাতের জন্য সকল ভাইবোনদের কাছে খাস দোয়ার আবেদন করছি এবং আল্লাহ্ তাআলা মরহুমের পরিবারকে সাবরে জামিল দান করুন, আমীন।

ফরহাদ হোসেন, মোয়াল্লেম

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল ***'হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অতুলনীয় জীবনাদর্শ'*** পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র বিশ্বের জন্য নবী। তিনি সকল নবীর নেতা। ইতোপূর্বে নবীরা আবির্ভূত হয়েছিলেন কোন নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য। কিন্তু মহানবী (সা.) এসেছিলেন স্থান-কাল পাত্র ভেদে সমগ্র মানবজাতির জন্য। তিনি কুরআনের জীবন্ত উদাহরণ। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাল্যকাল থেকেই লড়াই ঝগড়ার মধ্যে নিজেকে জড়াতেন না। বরং লড়াই ও কলহ মিটায়ে ফেলার চেষ্টা করতেন।

মক্কা এবং তার আশেপাশের গোত্রগুলোর যুদ্ধ বিগ্রহ দেখে দেখে চিন্তান্বিত হয়ে তিনি (সা.) মক্কার কিছু সংখ্যক যুবকদের নিয়ে মজলিসে 'হিলফুল ফুযুল' নামক একটি সংগঠন করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল মজলুমদেরকে সাহায্য করা। তিনি (সা.) কখনও খারাপ কথা বলতেন না, কখনও অহেতুক কসম খেয়ে কিছু বলতেন না। পাক-সাফ থাকার প্রতি তিনি (সা.) বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। মসজিদের পরিচ্ছন্নতার প্রতি তিনি (সা.) বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার রাখার জন্য তিনি (সা.) বার বার উদ্বুদ্ধ করতেন। রাস্তায় কোন ময়লা-আবর্জনা পড়ে থাকলে তিনি (সা.) নিজ হাতে তা পরিষ্কার করতেন। তিনি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি রাস্তা-ঘাটের পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দেয় খোদা তার প্রতি খুশী হন এবং তাকে সওয়াব বা পুরস্কার দান করেন।

তিনি (সা.) সব সময় গরীবদের অবস্থা ভাল করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বন্টন করতেন। তিনি (সা.) গোলামদের সাথে সর্বদা উত্তম ব্যবহার করতেন। এবং অন্যান্যদেরকেও সর্বদা আদেশ-উপদেশ দিতেন। তাছাড়া তিনি (সা.) সেই সব ব্যক্তিদের প্রতিও খেয়াল রাখতেন যারা মানবজাতির সেবায় নিজেদের সময় অতিবাহিত করেছেন।

নারীদের প্রতি উত্তম আচরণের ব্যাপারে তিনি (সা.) বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে নারির উত্তরাধিকার কায়েম করেছেন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে তিনি (সা.) অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করতেন। তিনি বলতেন জিব্রাঈল (আ.) আমাকে বারবার প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকতেন। তিনি (সা.) মা, বাবার সাথে উত্তম আচরণ করার গুরুত্ব বার বার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সা.) জীবন আদর্শ এতো ব্যাপক যা আমি বলে শেষ করতে পারব না। তাই আমাদের জীবন আদর্শ যেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন আদর্শের মতো হয় সেই চেষ্টায় যেন আমরা সবাই রত থাকি। আল্লাহ্ আমাদের সেই তৌফিক দিন, আমীন।

আহমদ উজ্জ্বল
ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অতুলনীয় জীবনাদর্শ

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগাগোড়া জীবনই আদর্শ, আর শুধু আদর্শই নয় সে আদর্শও অতুলনীয় ও সীমাহীন সমুদ্রের অপার ভান্ডার। হুযূর (সা.) এর জীবনাদর্শ বর্ণনা সাধারণ মানুষ তো বটেই বিশ্বের বড় বড় আলেমদের পক্ষেও বর্ণনা করে শেষ করার মত নয়। যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনে চরম ও পরম আদর্শ এক কথায় বর্ণনা করতে হয় তবে বলা যায় এবং নি:সন্দেহে বলা যায় যে তাঁর জীবনের অতুলনীয় আদর্শ ছিল বিশ্বে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা।

বিশ্বের সেই একক ও অতুলনীয় ব্যক্তি তিনিই যিনি সার্বিকভাবে বিন্দু হতে সিন্ধুকে নিম্নতম আকাশ থেকে মহাকাশে সংযুক্ত করে প্রতিটি অনু-পরমাণুর মাঝে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতীত নবীরাও তৌহিদের শিক্ষাই প্রকাশ ও প্রচার করে গেছেন কিন্তু মহানবী (সা.) সর্বব্যাপি তৌহিদের শিক্ষায় পূর্ণতা দান করেছেন। তার দৃষ্টি যেমনি সুদূর অতীতকে আয়ত্বে এনেছে, তেমনি ভবিষ্যতকে পরিপুর্ণভাবে খুলে খুলে বর্ণনা করেছে এবং দিক নির্দেশনা দান করেছে। তিনি (সা.) যে শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, তিনি শুধু সে শিক্ষার প্রচারকই ছিলেন না, তিনি নিজ জীবনে সে শিক্ষার বাস্তবায়নকারীও ছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা–কোন শ্রেণী, গোষ্ঠি, সম্প্রদায়, জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তিনি ছিলেন বিশ্ব মানবতার শিক্ষক। তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য আদর্শ ছিলেন। মাঠে ছিলেন তিনি আদর্শ রাখাল, ব্যবসায়ী হিসেবে ছিলেন আদর্শ ব্যবসায়ী, স্বামী হিসেবে আদর্শ স্বামী, বন্ধু হিসেবে আদর্শ বন্ধু, পিতা হিসেবে আদর্শ পিতা, সেনা নায়ক হিসেবে আদর্শ সেনানায়ক, রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে আদর্শ রাষ্ট্র প্রধান।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল মানুষের জন্য আদর্শ। শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, প্রেম প্রীতি ভালবাসায় ভরপুর আল্লাহ্‌র দায়িত্বে এক অতুলনীয় উপমা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল তার প্রিয় প্রভু আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের প্রতিটি ঘটনাই মোজেজা–লেখাপড়া জানতেন না কিন্তু যে জ্ঞান তিনি দান করেছেন বিশ্বের মহাজ্ঞানীরা সব একত্রিত হয়েও তাঁর সম্মুখে নত মস্তকে হতবাক হতে বাধ্য। আদেশ দিয়েছেন কর্তন করো না বৃক্ষ, ধ্বংস করো না মঠ মন্দির, গীর্জা, ধর্মীয় উপাসনালয়। পুরোহিত, জাযক, ধর্মীয় প্রধানদের সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাদের হত্যা করো না। যুদ্ধবন্ধীদের সাথে সদয় আচরণ কর, ভোখা রেখোনা তাদের। ভঙ্গ করো না অঙ্গীকার, ওজন ও মাপে কম দিও না। নারীরা তোমাদের মতই, তাদেরও প্রাপ্য তোমাদের মতই সব অধিকার। শত্রু মিত্র হয়েছে তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়ে, কে বলে তলোয়ার দিয়ে ইসলাম বিজয়ী হয়েছিল? সে মিথ্যাবাদী; তাকে আবেদন করছি, আজ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চরণ তলে আশ্রয় নাও দেখ তাঁর মাহাত্ম্য।

শ্রদ্ধায় তোমার শির অবনত হয়ে যাবে। ত্যাগ কর অহংকার যে অহংকার তোমার পথের বাধা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিনিই সেই একমাত্র মহাপুরুষ যিনি করেছেন সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য প্রেম সুধার নহর। তিনিই দেখিয়েছেন সেই রাজপথ যে রাজপথ নিয়ে যায় বান্দাকে তার প্রভু স্রষ্টার কাছে। ধিক সেই নরপশুদের যারা সেই মহাপুরুষের বিরুদ্ধে কলঙ্ক রচনা করে।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান
বড়চর, হবিগঞ্জ, জামালপুর

মানবতার মুক্তির অনুপম আদর্শ

মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর শ্রেষ্ঠ জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান ও সম্মানিত করার জন্য যুগে যুগে নবী-রসূল প্রেরণ করেন। ঐ সকল নবীগণ শুধু তাঁদের গোত্রের মধ্যেই ধর্ম প্রচার করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা; রহমতুল্লিল আলামীন সাইয়্যাদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে প্রেরণ করেছেন সমগ্র মানবের জন্য রহমতস্বরূপ।

খোদা তাআলার কাছ থেকে প্রেরিত সকল নবী-রসূলই কম-বেশী দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামকে জয়যুক্ত করা এবং

মানবতার মুক্তির জন্য যে অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। মানবতা, ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা, উদারতা, সমতা, দানশীলতা, আত্মত্যাগী, মহানুভবতা, সহযোগিতা, বুদ্ধিমত্তা, শক্তিমত্তা, সমবেদনা ইত্যাদি যত মানবীয় গুণাবলী অবশিষ্ট আছে সবগুলোই তাঁর (সা.) চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছিল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ তিনি (সা.) বজায় রেখেছিলেন।

মানবীয়গুণ বিশিষ্ট সকল আদর্শ হতে একটি থেকেও তিনি চুল পরিমাণ সরে দাঁড়ান নি। সুন্দর ও সুখে থাকার অজস্র সুযোগ পেয়েও তিনি সেদিকে খেয়াল করেননি। একজন সাধারণ মানুষ যেভাবে জীবন অতিবাহিত করেন ঠিক সেভাবে তিনি (সা.) আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বড় থেকে ছোট এমন কোন অত্যাচার ছিল না যা তাঁর (সা.) সাথে করা হয়নি। কিন্তু মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তাআলার বিশ্বস্ত এক মহান পুরুষ। ইনসাফ, সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায়বিচার, ন্যায়মীমাংসা, সহিষ্ণুতা ও সর্বপরি গরীবদের প্রতি ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রকৃত ভালবাসা। তাছাড়া এতিমদের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ খেয়াল। মহান আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে যতগুলো গুণ দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, ঠিক ততটুকু গুণের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তাই তাঁর জীবনের কর্মময় জীবনাদর্শগুলো বাস্তবরূপ দান করার মাধ্যমে তাঁকে (সা.) প্রকৃত ভালবাসা ও সম্মান প্রদান করা হবে।

শেখ মোহাম্মদ সানাউল্লাহ্
ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্ব জাতির নবী

বর্তমান সারা বিশ্বের যে অবস্থা তা দেখে মনে হয় শান্তির ধর্ম ইসলাম আর শান্তিতে নেই। যেখানেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সংঘটিত হচ্ছে আর সাথে সাথে দোষ দেয়া হচ্ছে ইসলামের উপর। তাই নি:সন্দেহে আমরা বলতে পারি, ইসলামে আজ প্রবেশ করেছে অশান্তি, অরাজকতা, নাশকতামূলক কর্মকান্ড। আমরা সচরাচর দেখছি ইসলামের নামে জঙ্গি কর্ম করছে আর নাম দিচ্ছে ইসলামের হিফাজতের জন্য নাকি এসব করছে। এক প্রকার নামধারী মুসলমান সন্ত্রাসীদের জন্য বিশ্বের মাঝে ইসলাম আজ সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। ধর্মের নামে বোমা মেরে মানুষ হত্যা করা, রক্তপাত ঘটানো, এসব কি শান্তির ধর্ম ইসলামে আদৌ বলা হয়েছে?

আমরা দেখতে পাই, আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগে যখন মানব সমাজ তাদের নিজস্ব পরিচয় মনুষত্ব হারিয়ে ইচ্ছা মাফিক ও স্বেচ্ছাচারী জীবন নিয়ে মত্ত ছিল ঠিক তখনই কোরাইশ বংশের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আরব জাহান তথা বিশ্ব মানবকূলের জন্য প্রেরণ করেন শান্তির বাণী দিয়ে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)–কে। জন্মলগ্ন থেকে যাঁর উছিলায় শান্তির স্বপক্ষে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশ্বময় রহমত আসতে থাকে। আপন মেধা, বিশ্বস্থতা, একনিষ্ঠতা বিবেচনা করলে এবং আইয়্যামে জাহেলিয়াত যুগের বর্বরতার কথা চিন্তা করলে এবং খোদ কোরাইশ বংশের কোন বর্বর নেতার কথা ভাবলে বুঝতে কষ্ট হয় না বরং আশ্চর্য লাগে, যে সত্য, ন্যায় এবং ইসলামের শান্তির কথা বলে সর্ব প্রথম আপন পরিবারের সাথে লড়াই করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কি মহানুভবতায় অগ্রসর হলেন ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের। তাঁর (সা.) লড়াই ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠার লড়াই, আর এ লড়াই ছিল ভালোবাসার লড়াই।

তিনি (সা.) প্রকৃত ইসলাম দর্শন, কুরআন মাফিক বিশাল এলাকা গড়ে তুলতে শাসক হিসেবে, যোদ্ধা হিসেবে, সঠিক সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষেত্রে অসাধারণ দৃষ্টান্ত তাঁর উম্মতের জন্য রেখে গেছেন। তিনি (সা.) সমাজে কোন ধরনের অশান্তির লেশমাত্র রেখে যান নি। অন্ধকার সমাজ ছিল, যেখানে কোন আলো দেখা যেত না, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশটির বুকে আলো জ্বালিয়ে দেখিয়েছেন ইসলাম আসলেই যে শান্তির ও কল্যাণের ধর্ম। পশুর তুল্য মানুষকে ফেরেশ্‌তার মত করে জগতের সামনে দাঁড় করিয়েছেন তিনি। তিনি (সা.) শুধু মাত্র একটি সুন্দর সমাজই প্রতিষ্ঠা করেন নাই বরং প্রকৃত ইসলামে শিক্ষা কি? ইসলাম পালন করলে কি লাভ এবং ইসলাম পৃথিবীতে কেন এসেছে এ সব কিছুই তিনি (সা.) তাঁর কর্ম দ্বারা শিখিয়ে গিয়েছেন।

ইসলাম প্রকৃতই যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তির নিশ্চয়তা দেয় তা-ও তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। ইসলামের গৌরবজনক ইতিহাস, অনুশাসন, ঐতিহ্যবাহী জীবন ব্যবস্থায় নারীর মূল্যায়ণ। পুরুষসহ সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রশ্ন ও প্রেক্ষিত এবং সমাধান দেখে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই ঈমান এনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো। সবাই এ কথা বলতে বাধ্য হতো যে, ইসলামই একমাত্র শান্তির ধর্ম হতে পারে। তাই সবাই ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করতো না।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, গুটি কতক নামধারী সন্ত্রাসীরা ইসলামের নামে অশান্তি সৃষ্টি করছে সর্বত্রে। যার ফলে বিভিন্ন দেশে আজ ইসলামকে মনে করে সন্ত্রাসী ধর্ম। আসলে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ইসলাম কখনো সন্ত্রসী ধর্ম হতে পারে না। যারা ইসলামের নাম নিয়ে অরাজকতা করছে তারা সন্ত্রাসী। আর তাদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী
তেজগাঁও, ঢাকা

মহানবী (সা.) এর আদর্শ

কুরআন করীমে মহান আল্লাহ্ তাআলা হযরত খাতামান নবীঈন মুহাম্মদ (সা.) কে সম্বোধন করে বলেছেন, "নিশ্চয় তুমি অতি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত" (৬৮ : ৫)। "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র রাসূলের মাঝে উৎকৃষ্টতম আদর্শ" (৩৩ : ২২)। "তাঁর মুহাম্মদ (সা.) এর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ" (বুখারী, আবু দাউদ)।

হযরত নবী করীম (সা.) এমন এক ব্যক্তি যাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনের অবস্থাদি এবং ঘটনাবলী আকর্ষণীয় এবং হৃদয়গ্রাহী। হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখলেও এর শেষ হবে না। তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনা কস্তুরীর ঘ্রাণের চাইতেও উৎকৃষ্ট। তাই কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয়েছে, "নিশ্চয়ই তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতি রহমতস্বরূপ অর্থাৎ "রহমাতুলিল্ল আলামীন"। তাঁর নবুওয়তের দাবীতে পূর্বেই সময়মত সাক্ষ্য এটাই ছিল যে তিনি সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত (আমীন এবং সিদ্দীক)। (সীরাত : ইবনে হিসাব) তিনি খোদার প্রতি এত আদব বজায় রেখে চলতেন, অপ্রয়োজনে তিনি আল্লাহ্ তাআলার নাম উচ্চারণ করাও পছন্দ করতেন না। যেমন কথায় কথায় খোদার নামে "কসম" কাটা!

তিনি পাক সাফ থাকা পছন্দ করতেন, সর্বদা দাঁত-মুখ পরিষ্কার রাখতেন, খানা খাবার পূর্বে হাত ভালভাবে ধুয়ে নিতেন, খাবারের পরে হাত ধুয়ে ফেলতেন এবং কুলি করতেন (বুখারী)। খাবারের পরে কুলি না করে নামায পড়তে অপছন্দ করতেন। রাস্তা ঘাট নিজে যেমন পরিষ্কার করতেন তেমনি অন্যকেও পরিষ্কার রাখার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সরল ও সাদাসিদে ছিলেন। খাবার পছন্দ না হলেও কখনো অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না। তাঁর কাছে যখন খাবার আসতো সাহাবাগণের সঙ্গে তা ভাগ করে খেতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি কখনো একনাগারে তিন দিন পেট ভরে খানা খান নি। বাসগৃহে তিনি সাদাসিদে থাকতেন, বিছানাপত্রও সাদাসিদে ছিল। তিনি গরীবদের প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করার জন্য চেষ্টা চালাতেন। তিনি বলতেন সে দাওয়াত নিকৃষ্ট দাওয়াত যেখানে গরীবকে ডাকা হয় না? (বুখারী) তিনি দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ্ আমাকে মিসকিন অবস্থায় জীবিত রাখো, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দিও এবং মিসকিনদের সাথী করেই কেয়ামতের দিন আমাকে উঠাইও। (তিরমিযী)

নারীদের প্রতি তিনি উত্তম আচরণ করেছেন এবং তাঁর সময়েই প্রথম বারের মত নারীরা স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন তখন সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। আরব দেশের

মানুষ ছিল তখন অত্যন্ত বর্বর। সেখানকার নিয়ম ছিল "জোর যার মুল্লুক তার"? তাঁর শুভাগমনের ফলে সেই বর্বর জাতি পরবর্তীতে পৃথিবীর শিক্ষক হিসেবে পরিণত হয়েছিল। তাই সফলতা পেতে হলে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসরণ করতে হবে। সুগন্ধিযুক্ত কোন জিনিসের সঙ্গে তুলনা যদি করা যায় তাহলে বলতে হবে যে এর তুলনা সুঘ্রাণ কস্তুরীর ঘ্রাণকেও হার মানায়। তাঁর জীবনাদর্শ আমাদের পাথেয় হোক, আমীন।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

সব গুণাবলীর সমাহার হযরত মুহাম্মদ (সা.)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয় আমি ও আমার ফিরিশ্‌তাগণ এ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করি, অতএব হে লোক সকল তোমরাও তাঁর (সা.) প্রতি বেশী বেশী সালাম ও দরূদ প্রেরণ করো (৩৩ : ৫৭)। মুহাম্মদ নামের অর্থ অতি প্রশংসিত। হুযূর (সা.) জীবনে এমন সব অসাধারণ ও সৎ গুণাবলীর সমাহার ঘটেছে যে, সে তুলনায় অন্য কোন নবী রসূল এর মধ্যে পাওয়া যায় না। হুযূর (সা.) সদাচরণ মহানুভবতা, কর্তব্য নিষ্ঠা, চরম বিপদে ধৈর্যশীল থাকা, অসম্ভব কষ্ট সহিষ্ণু, দানশীলতা, ভয়ঙ্কর শত্রুকেও ক্ষমা করা, আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপর তায়াক্কুল থাকা, সকল সৃষ্টির প্রতি অকৃত্তিম ভালবাসা, নিজ স্ত্রীদের সহিত প্রেমময়িতা, মানব সেবা, হৃদয়ের কোমলতা, শিশুপ্রেম, ব্যবসায় বিশ্বস্থতা, ন্যায় বিচার, সততা অতিথিপরায়ন, রক্ষিতা, দক্ষ সমর কৌশলতা, প্রগতিশীল, আদর্শিক চিন্তাবিদ, অল্পেতুষ্ট থাকা, খোদাপ্রেমে নিমগ্ন থাকা ইত্যাদি সহস্র গুণের একজন অদ্বিতীয় মহামানব রূপে সাক্ষ্য রেখে গেছেন। তাইতো তার এসব গুণে মুগ্ধ আরববাসী তাঁকে (সা.) আল আমিন, আস্-সাদেক উপাদিতে ভূষিত করেন।

জাহেলিয়াতের যুগে আরবের ধনী ব্যক্তিরা ক্রীতদাস, গরীব মিসকিন, অসহায় মহিলাদের উপর নিদারুন নির্যাতন চালাত। তাদের দুঃখ দেখে তাঁর (সা.) প্রাণ কেঁদে উঠত। শৈশবেই সে নিয়ে তিনি (সা.) চিন্তা করতেন কিভাবে তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করা যায়। যৌবনে পদার্পনে তিনি যুবকদের একত্রিত করে একটি সংঘ গড়ে তুলেন। উদ্দেশ্য ছিল সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করা। বিবি খাদিজার সংগে বিবাহ হওয়ার পর খাদিজা (রা.) তার সমস্ত সম্পদ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর হস্তে সমর্পণ করেন। হুযূর (সা.) স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে সব সম্পদ গরীবদের দান কর দেন। হুযূর (সা.) এর খাদেম ও পালিত পুত্র হযরত যায়েদ (রা.) মুহাম্মদ (সা.) এর প্রেমে এমনই আশক্ত হয়ে পরেন যে, স্বীয় পিতার সাথে বাড়ী ফিরে যেতে অস্বীকার করেন, তিনি (রা.) বলেন, আমি মুহাম্মদ (সা.) এর খাদেম অথচ তিনি (সা.) ই আমাকে বেশী সেবা করেছেন।

বদরের যুদ্ধে বন্দীদের প্রতি হুযূর (সা.) সদাচরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল উদাহরণ। ওহুদের যুদ্ধে হুযূর (সা.) মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মুর্চ্ছা যান। জ্ঞান ফিরার পর তিনি দোয়া করেন 'হে আল্লাহ্ এ জাতি তাদের নবীকে চিনতে পারেনি, তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও।' মক্কা বিজয়ের পর, হুযূর (সা.) উল্লাস করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতায় এতই বিনীত হয়ে দোয়া করছিলেন যে, তাঁর মাথা উষ্ট্রের পিঠে লেগে গিয়েছিল। সেদিন তিনি শত্রুর শত্রুতার প্রতিশোধ না নিয়ে, কয়েকজন সন্ত্রাসী বাদে সকলকে ক্ষমা করে দেন। হ্যাঁ, তিনি হলেন আমাদের নেতা মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.)। মহান খোদা তাআলা আমাদের সবাইকে এই মহান রসূলের আদর্শ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সাদেকা তাহের
উত্তরা হালকা, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে
আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'র 'নবীনদের পাতা'র পাশাপাশি প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**। এবারের পাঠক কলামের বিষয়-

"বল প্রয়োগ ইসলামের শিক্ষা নয়"।

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে। লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০১২-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-
সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১,
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

'ধর্মে কোন ধরনের বলপ্রয়োগ নেই।'....
(সূরা ঃ আল বাকারা : ২৫৭)

তুমি বল, এ সত্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত)। সুতরাং যে চায় সে ঈমান আনুক এবং যে চায় সে অস্বীকার করুক। ....
(সূরা ঃ আল কাহ্‌ফ : ৩০)

সংবাদ

সম্প্রতি রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলাধীন কিসমত মেনানগর গ্রামে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যদের উপর আক্রমণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং মসজিদ ভাংচুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সরকারের সুদৃষ্টি কামনায়– আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, গত ৭ নভেম্বর, ২০১২ কিসমত মেনানগর গ্রামে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যবৃন্দের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের ঘর-বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং সেখানে পুণঃনির্মাণাধীন একটি আহমদীয়া মসজিদ ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হয় এবং সর্বস্ব লুট করা হয়। মুষ্টিমেয় কিছু উগ্র ধর্মান্ধের প্ররোচনায় সংগঠিত এ ধরনের ঘটনায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং প্রকৃত দোষীদের আইনের আওতায় এনে সুষ্ঠু বিচার এবং আহমদীদের জান-মালের হিফাযত এবং মসজিদ পুণঃনির্মাণের সব বাধা দূর করার আবেদন জানানো হয়।

বিগত ২০০০ সালে কিসমত মেনানগর গ্রামে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে আহমদীরা একটি কাঁচা মসজিদ নির্মাণ করেন। কিন্তু এটি অ-আহমদীদের মসজিদের খুব কাছাকাছি হওয়ায় স্থানীয়দের আপত্তির মুখে আহমদীরা নিজেদের পুরনো ভিটা ছেড়ে প্রায় সোয়া কিলোমিটার দূরে সরে আসেন এবং সেখানে নামাযের জন্য ২০০৪ সালে একটি কাঁচা মসজিদ নির্মাণ করেন এবং বিগত ৮ বছর ধরে আহমদীরা সেখানে নামায আদায় করে আসছিলেন। গত ২৫ আগস্ট পুরনো কাঁচা মসজিদটির স্থলে একটি পাকা মসজিদ নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করা হয় এবং ৫ অক্টোবর পর্যন্ত মসজিদের নির্মাণ কাজ চলতে থাকে। এমতাবস্থায় গত ৫ অক্টোবর একদল উগ্রপন্থী মসজিদ নির্মাণ স্থলে এসে নির্মাণ কাজে বাধা সৃষ্টি করে এবং আহমদীদের নানাভাবে হুমকি প্রদান করে। ঘটনা জানতে পেরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উদ্যোগী হয়ে হাড়িয়ারকুটি ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে এক সভার আয়োজন করেন এবং নির্মাণ কাজ এক মাস স্থগিত রাখার পরামর্শ প্রদান করেন। আহমদীরা শান্তির স্বার্থে তা মেনে নেন এবং নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখেন। কিন্তু এক সপ্তাহ অতিবাহিত না হতেই বিরুদ্ধবাদীরা আবার তৎপর হয়ে ওঠে এবং অসমাপ্ত মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য স্থানীয় লোকজনকে উত্তেজিত করতে থাকে। শুধু তাই নয় তারা আহমদীদের নানা রকম ভয়-ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। এমনিভাবে গত ২৫ অক্টোবর, ২০১২ তারা মিছিল নিয়ে আহমদীদের বাড়ী-ঘরে ইট-পাটকেল ছোড়ে এবং কারো কারো বাড়ীর প্রবেশপথ বন্ধ করে রাখে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি শান্ত করলে মিছিলকারীরা নিকটবর্তী ডাংগীর হাট বাজারে গিয়ে উত্তপ্ত বক্তব্য রাখে এবং এলাকায় আহমদীয়া নির্মূল কমিটি গঠন করে।

পবিত্র ঈদের দিন আহমদীগণ নির্মাণাধীন মসজিদে ঈদের নামায আদায় করলেও তার পরপরই বিরুদ্ধবাদীরা আহমদীয়া জামাতের সদস্য রফিকুল ইসলামের বাড়ীতে লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়, ফলে প্রাণ বাঁচাতে তিনি জবাইকৃত কুরবাণীর গরু ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

উপরোক্ত ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিকতায় গত ৭ নভেম্বরের উক্ত আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ এবং লুটতরাজের ঘটনা ঘটানো হয়। ঘটনার পর এ বিষয়ে আহমদী সদস্য মিজানুর রহমান এবং পুলিশ বাদি হয়ে তারাগঞ্জ থানায় দুটি মামলা দায়ের করে।

এমতাবস্থায় সরকার প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অতিসত্ত্বর সব বাধা দূর করে মেনানগর গ্রামে আহমদীদের মসজিদটি পুণঃনির্মাণের বিষয়টি নিশ্চিত করে দেশের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার নিশ্চিত করা এবং আহমদীদের উপর হামলাকারী এবং তাদের উস্কানীদাতাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার দাবী জানিয়েছে আহমদীয়া জামাত।

বাংলাদেশের প্রায় ৭-৮টি টিভি চ্যানেল উক্ত সংবাদ সম্মেলনের সচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করেছে। এছাড়া দেশের নামকরা জাতীয় পত্রিকাও এই ঘটনার প্রতি নিন্দা জানিয়ে এর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে।

ঘাটুরা মসজিদের মক্তবে পাঠোত্তর প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

গত ১২/১০/২০১২ রোজ শুক্রবার দিন ব্যাপী ঘাটুরা জামাতের মসজিদ-এর মক্তবে পাঠ দান শেষে এক প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত প্রতিযোগিতায় অত্র মক্তবের ছাত্র/ছাত্রীরা নিজেদের উদ্যোগে সকল কর্মকান্ডে অংশ নেয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত, নযম, কুইজ, খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মজিবর রহমান লস্কর এর সভাপতিত্বে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং দোয়া করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে খাকসার ও মক্তব শিক্ষক এস এম নঈম উল্লাহ্ সহ ছাত্র/ছাত্রী ১৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক রনী

বগুড়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৬/১১/২০১২ তারিখে সদর মজলিসের অনুমোদনক্রমে সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত কর্মশালায় বগুড়া জেলা আমেলা ও বগুড়া–সিরাজগঞ্জ জেলার অধিনস্থ সকল স্থানীয় ৫টি মজলিসের মধ্যে ৪টি মজলিসের কায়েদ, মোতামাদ ও নাযেম মাল উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালা সকাল ৯-৩০ মিনিট হতে ১২ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এবং ২টা ৩০ মিনিট হতে ৮টা পর্যন্ত চলে। কেন্দ্র হতে মোহতামীম মাল মোহতামীম উমুমী এবং বগুড়া জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী সাহেবগণ সুন্দরভাবে কর্মশালা পরিচালনা করেন।

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে তবলিগী আশারা পালন

গত ১০ অক্টোবর হতে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত ১০ দিন ব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে বিশেষ তবলিগী আশারা পালন করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সময়ে সর্বমোট ২০৪ জনকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বাণী পৌঁছানো হয় এবং ৪২টি লিফলেট বিতরণ করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

মিলা পাটোয়ারী

Celebration of Centenary of Initiation of Collective Baiat in Bangladesh Held

Ahmad Tabshir Choudhury

Bangladesh is fortunate to have two Sahabis (Companions) of Promised Messiah and Imam Mahdi (AS) who accepted Ahmadiyya in 1905 and 1906. Hadhrat Ahmad Kabir Noor Muhammad sahib (Ra.) of Anwara police station of Chittagong received the message regarding the advent of Imam Mahdi (AS) while he was residing at Burma. He then went to Qadian to personally examine the matter and being satisfied he took Baiat at the holy hand of Hadhrat Masih Maud (AS) in 1905. Similarly, Hadhrat Raisuddin Khan sahib (Ra.) of Nagergaon village of Kishoreganj district received the news while he was serving as Post Master in Burma. Then he also went to Qadian and accepted Ahmadiyyat at the hand of Hadhrat Masih Maud (AS) in 1906 and later his wife Begum Azizatunnissa saheba (Ra.) accepted Ahmadiyyat in 1907. In 1908 Janab Abdul Khaleque Magistrate sahib of Bharatpur, Murshidabad (now under West Bengal, India) and in 1909 Khan Sahib Maulvi Mubarak Ali sahib of Bogra, Bangladesh also accepted Ahmadiyyat. Later Khan Sahib Maulvi Mubarak Ali sahib was made Missionary, first in London in 1920 and later in Germany in 1922 by Hadhrat Khalifatul Masih II (Ra.).

However, the institution of Nizam-e-Jama'at or formal establishment of Ahmadiyya Muslim Jama'at in Bangladesh was established in 1913 at Brahmanbaria. Earlier, on 8th November, 1912, Hadhrat Maolana Syed Abdul Wahed sahib (Rahe.), who was a great Islamic scholar of this sub-continent and a resident of Brahmanbaria, Bangladesh took Baiat at the holy hand of Hadhrat Khalifatul Masih I (Ra.) at Qadian. Hadhrat Maolana sahib returned to his own land Brahmanbaria town on 22nd November, 1912 and openly declared about his acceptance of Ahmadiyyat. As he was the Chief Imam of Brahmanbaria Central Jame Masjid and Head Maolana of local Annada High School, he called people to accept Imam Mahdi and announced that he is going to take Baiat of people on behalf of Khalifatul Masih on 25th November, 1912. This created a mixed reaction among the people and a good number of his followers (as he was also a Peer) accepted Ahmadiyyat on that day, at the same time lot of people went against him. Within a short period of time a large number of populations of Brahmanbaria and surrounding villages accepted Ahmadiyyat.

Hadhrat Maolana Syed Abdul Wahed sahib (Rahe.)

Tahajjud Prayers inside the century old mosque.

To commemorate this historical occasion and express our profound gratitude to Almighty Allah, a special program was organized on 25th November, 2012 at Masjidul Mahdi, the first Ahmadiyya Mosque built by Hadhrat Maolana Syed Abdul Wahed sahib (Ra.) at his residential complex at Maulvipara of Brahmanbaria town about one hundred years ago. Muhtaram National Ameer Mobasher ur Rahman sahib and his National Majlis Amela, Ameers and Presidents of Local Jama'ats and Murabbian and Muallemeen from different Jama'at of Bangladesh took part in this blessed occasion in hundreds. Many other Ahmadis also participated individually in this blessed program.

The program started on early morning of 25th November, 2012 with offering of Tahajjud Prayers at 4:00 A.M. lead by Murabbi Silsila Maolana Muhammad Solaiman at the century old small mosque "Masjidul Mahdi" which is still almost in its original form. Due to large number of attendees, separate arrangements were made outside the mosque to accommodate people. After Tahajjud prayers, Muhtaram National Ameer sahib led the Fajr Prayer and delivered Darsul Qur'an from the relevant Chapter of the Holy Qur'an: "Sura Jumua"

sitting on the century old Mimbar used by Syed Abdul Wahed sahib. After the Dars and collective silent prayers sweets were distributed among the members and guests. Then all went to visit (ziarat) the graveyard of Hadhrat Sayed sahib, situated adjacent to the mosque and offered silent prayers.

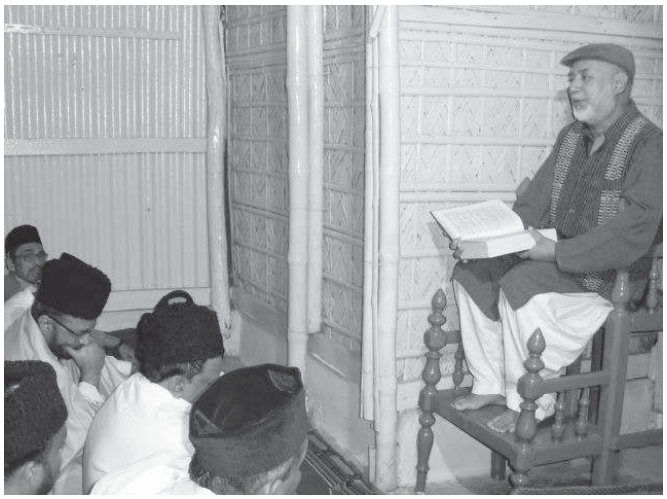

Ameer sahib delivering Dars sitting on Century Old Mimber

After the ziarat, a program was held inside the mosque conducted by MTA, Bangladesh, where Muhtaram National Ameer sahib spoke on the significance of the day and our responsibilities. After that many participants including descendants of Maolana Syed Abdul Wahed sahib and other pioneers spoke and expressed their feelings one by one. Among them, Syed Mumtaz Ahmad the grandson of Hadhrat Maolana Syed Abdul Wahed sahib and the eldest son of late Maolana Syed Ijaz Ahmad sahib, (Murrabbi Silsila) spoke on behalf of the family. Among others Prof. Meer Mubashsher Ali, Naib National Ameer and grandson of Prof. Abdul Latif sahib (one of the pioneers), Maolana Abdul Awwal Khan Chowdhury, Muballigh In-charge and descendant of Syed Abdul Wahed sahib (from mother's side), Ameer sahib Dhaka Muhtaram Afzal Ahmad Khadim, son of late Advocate Ghulam Samdani Khadim sahib (who accepted Ahmadiyyat in 1914-15) and nephew of late Ghulam Mawla Khadim sahib (accepted Ahmadiyyat in 1912-13), National Secretary Finance Hamidur Rahman sahib, the youngest son of late Allama Zillur Rahman sahib (who was 100th in number of initial Mubayeen and father of Advocate Mujeeb ur Rahman sahib, now in Pakistan), and representatives of different Jama'ats spoke and expressed their feelings. Muhammad Jahagir Babul, National Secretary and the Historian of Ahmadiyyat in Bangladesh gave a short speech from historical aspects. Two guests from Pakistan who were on personal visit to Dhaka also joined us expressed their feelings. They were: Sheikh Sayeedullah sb, an Ahmadi businessman from Pakistan and another Janab Shamsi sahib now living at London. Muhammad Ehsanul Habib Joy presented a self-composed Nazm (poem) on centenary celebration along with Sibgatur Rahman Mukul and Menhaz Uddin Thakur (Alak). The

Ziarat at the grave of Hadhrat Syed Abdul Wahed sahib.

program continued till 7:45 A.M. It was an excellent and faith-inspiring historical session. Ahmad Tabshir Choudhury, In-charge MTA Bangladesh and National Secretary Audio Video conducted the session supported by MTA volunteers: Naser Ahmad, Nasiruzzaman Tipu, S.M. Shumon Ahmad and Jasim Uddin.

At 8:00 A.M. Muhtaram Mobasherur Rahman sahib, National Ameer unveiled the Centenary Logo of Bangladesh. National Ameer sahib also explained the significance of the Logo designed. This short program was conducted by Nurul Islam Mithu, National Secretary Publications and Nasiruddin Millat, National Secretary, Sanaat-o-Tejarat.

Press Conference:

At 11:00 A.M a Press Conference was organized by Ahmadiyya Muslim Jama'at, Brahmanbaria to formally announce and publish the news of Centenary Celebration. Muhtaram National Ameer sahib presided over the meeting. Maolana Nawshad Ahmad recited from the Holy Qur'an and then Muhtaram National Ameer sahib read out the "theme paper". After that, a documentary "One Community One Leader" was showed to journalist in short form. Then general discussions and Question & Answer session took place. Maolana Abdul Awwal Khan Chowdhury, Muballigh In-charge and Naib National Ameer, Professor Meer Mubashsher Ali, Naib National Ameer and National Ameer Mubasher ur Rahman sahib answered the various questions of journalists. There were about 37 (thirty seven) journalists and reporters including local representatives of 4 (four) national TV channels attended the Press Conference. Vice President and General Secretary and former General Secretary of Brahmanbaria Press Club also attended the Press Conference.

Besides explaining the purpose and background of our Centenary Celebration, we also have explained

Press Conference & a portion of journalists attended.

and answered various questions raised by the journalists, such as Amadiyya Belief, differences between Ahmadis and non-Ahmadi Muslims, reason of having separate mosques and Imam, Jihad, success and achievements of Amadiyyat, etc. We also appealed to the journalists to create public awareness for getting back 4 Ahmadiyya mosques being forcibly occupied by Mullahs since 1987 in Brahmanbaria, Bhadughar, Ghatura and Kharampur.

The journalists were also presented with the Bangla translation of Huzur Aqdas' Friday Sermon of 21st September and Address at Capitol Hill and other literatures.

Alhamdulillah, it was a unique and rare occasion to talk and convey the real message of Ahmadiyyat to such a good number of journalists, especially in Brahmanbaria, the birth place of Ahmadiyya Jama'at in Bangladesh, where in present days people are usually scared to know about Ahmadiyyat due to strong opposition.

Press Conference & a portion of journalists attended.

Ameer sahib of Brahmanbaria Janab Manzur Hossain also set on the dais and the program was conducted by Ahmad Tabshir Choudhury, In-charge, MTA, Bangladesh. Allah showered enormous blessings to make this historic occasion a grand success. All praise goes to almighty Allah.

Finally, this is to inform you all that the Centenary Celebration of Establishment of Jama'at in Bangladesh will be observed throughout the year in 2013 insha Allah. The main centenary program will be our 89th Jalsa Salana, which is going to take place on 8th, 9th and 10th February, 2013 (Friday, Saturday & Sunday). We invite you all to our Jalsa Salana and request for prayers.

Formal Establishment of Ahmadiyyat Muslim Jama'at in Bengal:

Though Baiat in mass scale started from 25th November, 1912, but the iInstitution of Jama'at was established in 1913. In 1913, Hadhrat Khalifatul Masih I (Ra) sent Hadhrat Dr. Mufti Muhammad Sadeq sahib (Ra.), the great companion of Hadhrat Masih Maud (AS) to Brahmanbaria to establish a Jama'at. Hadhrat Mufti sahib came and formed the Institution of Jama'at (Nizam-e-Jama'at) and made Hadhrat Syed Abdul Wahed sahib as first President and Janab Dawlat Khan Munshi sahib as General Secretary of Anjuman-e-Ahmadiyya, Brahmanbaria. This is how the Jama'at in Bangladesh started its journey. Later in 1916 Anjuman for entire Bengal was established and Hadhrat Syed Abdul Wahed sahib (Rahe.) was made the First Ameer of all Bengal Jama'at.

This may also be mentioned here that Hadhrat Maolana Syed Abdul Wahed sahib had been communicating with Hadhrat Masih Maud (AS) through letters since 1902. Hadhrat Masih Maud (AS) mentioned some of those correspondences in his famous book "Baraheene-e-Ahmadiyya" Vol. 5. Commenting on Syed sahib, Huzur (AS) mentioned in one of his letters that he was getting "soothing smells" from Bengal.

However, Syed sahib couldn't take Baiat during the lifetime of Hadhrat Masih Maud (AS). But he continued extensive study on Ahmadiyyat. He was also communicating with contemporary other Muslims scholars/Ulamas who were mostly anti-Ahmadiyyat. He also met some of them on his way to Qadian. Finally, with his complete satisfaction he reached Qadian and took Baiat on 8th November, 1912 at the hands of Hadhrat Khalifatul Masih I (Ra.). Three more persons from Bangladesh who accompanied Hadhrat Maolana sahib also accepted Ahmadiyyat at that time. They were: Qari Delwar Ali sahib, Janab Emdad Ali Chowdhury sahib and Janab Dhonu Munshi sahib. All of them also belonged to Brahmanbaria area. After staying few days at Qadian, Maolana sahib returned to Brahmanbaria and stated taking Baiat on 25th November, 1912. May Allah reward them all with His choicest blessings and raised their status in the Heaven, Ameen.

This may also be mentioned here that in February, 1905 Hadhrat Masih Maud (AS) received a revelation that, "Ahle Bangala ki nizbat jo hokum jari kia gia tha, aab unki diljuyee hogi" (Tadhkera). This is also a great honor and privilege for the Bengalese. Alhamdulillah.

We request you all, kindly remember Bangladesh in your prayers.

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১. প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২. প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩. সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪. রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫. রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬. আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭. আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯. দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

بسم الله الرحمن الرحيم

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

ডিসেম্বর ২০১২, এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য অনুষ্ঠানসূচী (প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭:৩০ এর পর)

তারিখ	বিষয়বস্তু
০১/১২/১২, শনি ও ০২/১২/১২, রবিবার	"সত্যের সন্ধানে" ১৯ তম পর্ব (নতুন) শেষের ২ দিন
০৩/১২/১২, সোম URDV 551 (পুণঃ)	বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানঃ "বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ খলিফার দিক নির্দেশনা" — অংশ গ্রহণেঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী ও আহমদ তবশির চৌধুরী।
০৪/১২/১২, মঙ্গল URDV 547 (পুণঃ)	"স্মৃতি কথা" - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, উপস্থাপনায়ঃ আহমদ তবশির চৌধুরী।
০৫/১২/১২, বুধ URDV 548 (পুণঃ)	"স্মৃতি কথা" - আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, উপস্থাপনায়ঃ আহমদ তবশির চৌধুরী।
০৬ - ১২/১২/১২ বৃহস্পতি - বুধ	পুণঃপ্রচার - "সত্যের সন্ধানে" ১৯ তম পর্ব (৭ দিন)
১৫/১২/২০১২,শনি URDV 551 (পুণঃ)	বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানঃ "বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুগ খলিফার দিক নির্দেশনা" — অংশ গ্রহণেঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী ও আহমদ তবশির চৌধুরী।
১৭/১২/২০১২,সোম URDV 552 (পুণঃ)	গাহরে শাহু, লাহোরের আহমদীয়া মসজিদে জঙ্গী হামলার চাক্ষুশ স্বাক্ষী - আব্দুল মুসাব্বির ওয়াকার, সাক্ষাতকার গ্রহণেঃ মাওলানা বশিরুর রহমান।
১৮/১২/২০১২,মঙ্গল **URDV 544 (নতুন)**	মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের সাক্ষাৎকার, উপস্থাপনায় - আহমদ তবশির চৌধুরী। শিশুদের অনুষ্ঠানঃ "এসো গল্প শুনি", পরিচালনায়ঃ সৈয়দা আমাতুর রশিদ।
১৯/১২/২০১২,বুধ **URDV 556 (নতুন)**	"স্মৃতি কথা" - জনাব মোহাম্মাদ খলিলুর রহমান, উপস্থাপনায়ঃ আহমদ তবশির চৌধুরী।
২২/১২/১২, শনি **URDV 557 (নতুন)**	প্রামাণ্যে অনুষ্ঠানঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় শতবার্ষিকীর সূচনা
২৪/১২/১২, সোম **URDV 558 (নতুন)**	তথ্যভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠানঃ মহানবীর (সাঃ) প্রতি অবমাননাকর চলচ্চিত্র নির্মাণের বিরুদ্ধে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিক্রিয়া। অংশগ্রহণেঃ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ; উপস্থাপনায়ঃ আহমদ তবশির চৌধুরী
২৫/১২/১২, মঙ্গল **URDV 559 (নতুন)**	পুস্তক আলোচনাঃ "আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলা স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব" এবারের ব্যক্তিত্বঃ জনাব সূফী মতিউর রহমান বাঙ্গালী, আলোচনায়ঃ প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, জনাব যাফর আহমদ ও জনাব জাহাঙ্গীর বাবুল।
২৬/১২/১২, বুধ **URDV 560 (নতুন)**	আলোচনা অনুষ্ঠানঃ "বাংলাদেশে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া"- অংশগ্রহণেঃ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের বর্তমান ও কয়েকজন প্রাক্তন সদরঃ সর্বজনাব খলিলুর রহমান, মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ, ডাঃ মোহাম্মদ সেলিম খান, মাহবুবুর রহমান, আবু নঈম আল-মাহমুদ এবং আব্দুল মোমেন; উপস্থাপনায়ঃ নূরুল ইসলাম মিঠু।
২৯/১২/১২, শনি **URDV 561 (নতুন)**	ইসলাম বিরোধী চলচিত্র নির্মাণের প্রতিবাদে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত (হুযুরের খুতবার আলোকে) - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী; সন্তোষপুরের (উথলী) আব্দুল গফুর মাস্টার সাহেবের একটি সাক্ষাতকার।
৩১/১২/১২, সোম **URDV 562 (নতুন)**	খুলনা বিভাগের কয়েকজন ত্যাগী লাজনা সদস্যার সাক্ষাতকার (পর্ব-২); ছোটদের ধর্মীয় শিক্ষার অনুষ্ঠানঃ (পর্ব - ১) পরিচালনায় - প্রফেসর অমীর হোসেন।

- *প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় (শীতকালীন সময় অনুযায়ী)- লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে যুগ খলিফার জুমুয়ার খুতবার সরাসরি সম্প্রচার এবং খুতবার পর কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান,*
- *প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টায় — পূর্ববর্তী জুমুয়ার খুতবার পুণঃপ্রচার*
- *প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় — কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান ।*
- *২৮, ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর, ২০১২, শুক্র, শনি ও রবিবার : ১২১ তম জলসা সালানা, কাদিয়ান।*

নিয়মিত এমটিএ দেখুন, নিজের ও পরিবারের হেফাজত করুন

প্রচারেঃ এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও
যোগাযোগঃ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪, বকশি বাজার রোড, ঢাকা - ১২১১
Email: atabshir@hotmail.com **Web:** www.mta.tv; www.ahmadiyyabangla.org; www.alislam.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 75 | 10th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

30th November, 2012 | Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রূপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com